ছোটদের চার্লি চ্যাপলিন

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশ কাল :
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শুভাশীষ বল
গীতাঞ্জলি প্রকাশনী

॥ এক ॥

দেখতে দেখতে কত রোদ উঠলো। সূর্য বুঝি ভুলে গেলো রবিবারের সকালে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়তে। কেনিংটন রোডের দুধারে ছবির মত সাজানো বাড়িঘর। সামনে আবার লোহার বাহারী রেলিংঘেরা ঝুল বারান্দা। এ রাস্তা দিয়েই নাকি রাজা চতুর্থ জর্জ টমটমে চড়ে হাওয়া খেতে যেতেন। সকাল থেকেই জুড়ি গাড়ির ভীড়। রং-বেরং জোব্বা পরা নানাবয়সী কোচোয়ান। খানদানী রইস আদমীরা জুড়িগাড়ি থেকে নেমে গট্‌গটিয়ে ঢুকে পড়ছেন নামীদামী রেঁস্তোরা আর পানশালাতে। কী যে জলুস তাদের পোশাকের! চেক কাটা স্যুট, পশমের টুপি আর হীরের আংটির রূপের ঝলকে ধাঁধিয়ে যেতো চোখ। গলাবন্ধের হীরের পিনে আলো পড়ে এক অদ্ভুত মায়া ছড়াতো চতুর্দিকে। অর্থ, আভিজাত্য, অহংকার আর রূপের হাটের এককোণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো একটি ছেলে। অবাক হয়ে বিভোর চোখে দেখতো ধনীদের এই ভারি সুন্দর জগত! দেখতে দেখতে হয়ে পড়তো আনমনা, রাস্তার জাফরিকাটা রোদ-ছায়া দেখে বুঝতো বেলা বেড়েছে। পা বাড়াতো বাড়ির পথে।

ছেলেটির বয়স কতই বা তখন—বারো। থাকে বস্তিতে। গালভারি ঠিকানা—তিন নম্বর পাওন্যাল টেরাস্। ভাঙ্গাচোরা রঙওঠা ক্ষয়ে যাওয়া বাড়িটা। হাড়জিরজিরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই ডানদিকে চোখে পড়ে খুপরি ঘরটা। ছোট্ট এক চিলতে ঘর। ছাদটা এত নীচু যে মনে হয়—যে কোন মুহূর্তে ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে। চাপা দমবন্ধ করা ঘরের বাতাসে পচা জল আর পুরনো কাপড় চোপড়ের মিশ্র গন্ধ খেলা করে সর্বদা।

ছেলেটির নাম চার্লি। চার্লি চ্যাপলিন। ওর এক ভাই আছে। বৈমাত্রেয় ভাই সিডনি—চার্লির চেয়ে চার বছরের বড়ো। সংসারের হাল ধরতে সিডনি গেছে সমুদ্রে। কাজ নিয়েছে জাহাজে। আর আছে ওর মা। আজ তিনদিন ধরে মা একইভাবে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বিষণ্ণ চোখে জানালার ধারে বসে আছেন। চার্লি বোঝে মায়ের দুঃখ। ভাড়া করে আনা সেলাই মেশিনটার ভাড়ার টাকা বাকী পড়েছে। মালিক তাই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে মেশিনটা। সেলাই থেকেই যা হোক অল্প কিছু রোজগার হতো মায়ের। একজনকে নাচ শিখিয়ে চার্লি পেতো পাঁচ শিলিং। এনে দিতো মাকে। এম্নিকরে টেনেটুনে কোনরকমে কাটতো ওদের দিন। এখন ওদের ঘোর দুঃসময় চলছে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে সব। তদুপরি দুমাসের ওপর হলো সিডনির কোন খবর নেই।

বাড়িতে আজ কোন খাবারদাবার নেই। মা উপোস করেই কাটিয়ে দেন। চার্লিকে পাঠিয়ে দেন ম্যাকার্থিদের বাড়িতে। ওদের ছেলে ওয়ালির সংগে খেলা করে সে। সন্ধ্যে হলেই ওরা চার্লিকে চা খেতে ডাকে—শুধু চা নয়, ভালো খাবারটাবারও থাকে। এম্নিভাবে চার্লির খাবার জোটে। ম্যাকার্থিরা চার্লির মায়ের পুরনো বন্ধু। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। অথচ খুব ছেলেবেলায় চার্লির দিন কেটেছে স্বাচ্ছন্দ্যময় আনন্দে···

রবিবার হলেই চার্লির মা—ওদের দুভাইকে সাজিয়েগুজিয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। চার্লিকে পরাতেন নীল রঙের ভেলভেটের পোশাক, সঙ্গে হাতে ঘননীল দস্তানা। সিডনি পরতো ইটন স্যুট—ঢোলা প্যান্ট আর কোট। ভারী চমৎকার সাজতেন চার্লির মাও। তাঁর ছিলো ফর্সা রং, নীলচে বেগুনী চোখ। এক ঢাল হালকা বাদামী রঙের চুল। তিনি চোখ ধাঁধানো রূপসী ছিলেন না—কিন্তু তাঁর ছিলো অনিন্দ্যসুন্দর পবিত্র কমনীয় মুখ। হাত ধরাধরি করে গটমটিয়ে

রাস্তায় হেঁটে বেড়াতো চার্লি আর সিডনি। মিষ্টি বকুনী দিতে দিতে পেছনে হাঁটতেন চার্লির মা।

তখন বসন্তেও লণ্ডন একটু যেন গোমড়ামুখো, নিরুত্তাপ। গম্ভীর আর রাশভারি। ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি ছুটতো ওয়েস্টমিনিস্টার সাঁকোর রাস্তা দিয়ে। সাঁকোর কাছাকাছি পৌছে তুলকি চালে মোড় ঘুরতো। চার্লি সব দেখতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওরা তখন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ রোডে নতুন বাসায় থাকতো। চার্লির মা তখন প্রচুর রোজগার করতেন। ওসব অঞ্চলের পরিবেশ খুবই চমৎকার। সুন্দর দোকান। কত সুন্দর রেঁস্তোরা। লেবু, আপেল, ন্যাসপাতি আর কলার বাহার! থরে থরে সাজানো ফল—ফলের দোকান। মুগ্ধ চোখে দেখতো সব চার্লি। মায়ের সংগে ঘোড়ায় টানা বাসে যেতে যেতে চার্লি ছিঁড়ে নিতো লাইলাক গাছের পাতা। পকেটে জমিয়ে রাখতো ট্রাম-বাসের কমলা, নীল, ফিকেলাল আর সবুজ রঙের টিকিট। হাতে থাকতো খেলনা। আর রংবেরংয়ের বেলুন নিয়ে ও চলতো চার্লির খেলা। ফুলওয়ালী মেয়েটি একমনে বাঁধতো কোটের বোতামঘরে গুঁজবার ছোট ছোট গোলাপ-স্তবক। পাশ দিয়ে যাবার সময় গোলাপ ফুলের সদ্য জল দেওয়া তাজা ম-ম করা গন্ধ নিতো চার্লি। কেন যেন মন কেমন করা বিষাদে ভরে উঠতো চার্লির মন। ভোঁ বাজাতে বাজাতে সাঁকোর নীচে দিয়ে চলে যেতো ছোট ছোট জাহাজ। সাঁকো পেরুবার আগে কলের চাকা ঘুরিয়ে ধোঁয়া বেরুনোর চিমনীগুলো চটপট নামিয়ে নিতো খালাসীরা। এই হচ্ছে চার্লির শিশুকাল···লণ্ডন শহর···চার্লির ধ্যান-ধারণা···এই সব বর্ণাঢ্য ছবিকে ঘিরেই একটু একটু করে বড় হতে থাকে চার্লি। বেড়ে উঠতে থাকে চার্লির চেনা-অচেনা পৃথিবী। দৃশ্য-অদৃশ্য খড়ির গণ্ডী অতিক্রম করে ফেলতে থাকে ছোট্ট চার্লি।

॥ দুই

তারিখটা ষোলোই এপ্রিল। সনটা আঠারোশো উনানব্বই। ঠিক রাত আটটায় লণ্ডন ওয়ালওয়ার্থের ইস্ট লেনে চার্লির জন্ম। কি অদ্ভুত যোগাযোগ! সে বছরেই আমেরিকাতে জন্মেছিলেন সিনেমা শিল্পের অন্যতম জনক টমাস আলভা এডিসনও।

চার্লির জন্মের কয়েকদিন পরেই বাসা বদল হলো। ল্যামবেথে সেণ্ট জর্জেস রোডের কাছে ওয়েস্ট স্কোয়ারে। চার্লির মা ও বাবা দুজনই ছিলেন অভিনয় শিল্পী। সপ্তাহে পঁচিশ পাউণ্ড মাইনে পেতেন চার্লির মা। বাবা পেতেন আরও বেশী, সপ্তাহে চল্লিশ পাউণ্ড। কিন্তু তাঁর ছিলো মদ্যপানে গভীর আসক্তি। সব সময়ই মদে চুর হয়ে থাকতেন। অতিরিক্ত মদ খেয়ে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই মারা যান তিনি।

চার্লির জন্মের এক বছর পরেই বাবা-মার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ছোটবেলায় বাবাকে কাছে পায়নি চার্লি। বাবার কথা মনেও আছে খুব কম। মার কাছে শুনেছিলো যে ওর বাবা নাকি দেখতে ছিলেন ঠিক সম্রাট নেপোলিয়নের মত। কুচকুচে কালো দুটি চোখের মনিতে শান্ত ভাবুক মনের নির্বিবাদী মানুষ। ভরাট গম্ভীর মিষ্টি স্বরের একজন নামী অভিনেতা।

চার্লির মা থিয়েটারে যাবার আগে দু'ছেলেকে খাইয়েদাইয়ে একই বিছানায় পাশাপাশি শুইয়ে রেখে যেতেন। মা রাত করে ফিরতেন, ঘুম থেকে উঠতেনও বেশী বেলায়। প্রতি রাতে থিয়েটার থেকে ফেরার পথে চার্লিদের দুভাইয়ের জন্য আনতেন কেক, মিষ্টি, চকোলেট বা ভালো ফলমূল। চেঁচামেচি করলে রেগে যেতেন খুব—চার্লি আর সিডনি সুবোধ বালক হয়ে থাকতো কাজের মেয়ের কাছে।

সাড়ে তিন বছর বয়স পর্য্যন্ত চার্লিদের সংসারে কোন কিছুর অভাব ছিলোনা। সে সময়টা বড়োই মজায় কেটেছিলো চার্লির। খাওয়া-পরা-থাকার কোন অভাবই ছিলোনা। ওদের ছিলো অনেক সুন্দর সুন্দর জামাকাপড়। একদিনের ঘটনা। সিডনি হাতের কারসাজিতে মুখ দিয়ে পয়সা গিলে মাথার পেছন দিয়ে বের করার ভেল্কি দেখালো। চার্লিই বা কমতি কিসে! গিলে ফেললো আস্ত একটা আধপেনী পয়সা। শেষে বাধ্য হয়ে মা ডাকলেন ডাক্তার। বেরুলো পয়সা।

ছিমছাম সাজানো তিনখানা ঘর চার্লিদের। চার্লির বার বারই মনে পড়ে যেতো নেল গুঁইয়ের আঁকা ওর মায়ের মস্ত বড়ো ছবিটার কথা। ঘরের এক কোনে রাখা পিয়ানোর কথা। চার্লির সব চেয়ে প্রিয় ছিল খেলনা চেয়ারটা। ছ পেনী দাম দিয়ে বেদেদের কাছ থেকে কেনা। যা ছিলো চার্লির একান্তই নিজস্ব।

চার্লিদের অবস্থা পড়ে যাবার মূলে হলো গলার স্বর। এম্নিতেই তেজী গলা ছিলোনা চার্লির মায়ের। একটু ঠাণ্ডা লাগলেই গলা বসে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হতো। সেই গলা নিয়েই অভিনয় চালিয়ে যেতেন দিনের পর দিন। তার ফলে গলা চিরে অস্পষ্ট ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরুতো। ক্ষ্যাপা দর্শকের ব্যঙ্গবিদ্রূপে, হাসিতে আর হুয়োতে অপমানিত চার্লির মা মুখ কালো করে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যেতেন। এম্নি করেই দিনে দিনে ধীরে ধীরে ফুরিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিলেন চার্লির মা, সরে যাচ্ছিলেন পাদ-প্রদীপের আলো থেকে দূরে আরো দূরে।

চার্লির প্রথম মঞ্চে ওঠারও হাতে খড়ি পাঁচ বছর বয়সে। বাড়িতে একা থাকতে হবে বলে ওর মা ওকে সংগে করেই থিয়েটারে যেতেন। উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে চার্লি। দেখে শোনে সব কিছু। মায়ের গলা বসে যাওয়া, দর্শকদের আমুদে হাসি, চেঁচামেচি আর কুকুর-বেড়াল ডাকা। নীরব নত মুখে চুপচাপ স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকেন চার্লির মা— শেষে আর থাকতে না পেরে দ্রুত পায়ে মঞ্চ থেকে যেন পালিয়ে

আসেন। স্টেজ ম্যানেজার যাচ্ছেতাই অপমান করলেন চার্লির মাকে। ম্যানেজার শুনেছিলো চার্লির গান, মায়ের অনুকরণে গান-গাওয়া। উপায় না দেখে অশান্ত দর্শককে শান্ত করতে চার্লির মা নিজের হাতে ছেলেকে নিয়ে মঞ্চে গেলেন। দর্শকদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ধীর শান্ত পায়ে বেরিয়ে গেলেন মঞ্চ ছেড়ে। পাদ প্রদীপের উজ্জ্বল আলোর নীচে চার্লি একলা দাঁড়িয়ে···

শুরু করলো জ্যাক জোন্সের সেই চিরপরিচিত গান দিয়ে। গান শেষ না হতেই মঞ্চে টাকা পড়তে লাগলো। চার্লি দর্শকদের বললো যে আগে টাকা কুড়িয়ে নেবে—পরে বাকীটুকু গাইবে। বিপুল হর্ষধ্বনিতে চার্লিকে অভিনন্দিত করলো দর্শক। স্টেজ ম্যানেজার চার্লিকে একটা রুমাল দিলে পর, চার্লি কুড়িয়ে নিলো তাতে সব টাকা পয়সা। ম্যানেজার রুমালভর্তিটাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলো স্টেজ থেকে। স্বগতোক্তির গলায় চার্লি বলে উঠলো, 'ম্যানেজারই নিয়ে নেবে নাকি সব?' শুনে দর্শকরা দ্বিগুন জোরে হেসে উঠলো। স্বস্তি না পেয়ে উদ্বেগ নিয়ে ম্যানেজারের পেছন পেছন গিয়ে চার্লি দেখে এলো ম্যানেজার রুমালের টাকা মায়ের হাতে দিলো কিনা। রুমালটা মা হাত বাড়িয়ে নিতেই নিশ্চিন্তে ফিরে এসে গান গাইতে শুরু করে দিলো চার্লি। না, দ্বিধা নেই, জড়তা নেই ছিটেফোঁটা। কথা বলে, নেচে, মায়ের অনুকরণে সুর করতে গিয়ে, মায়ের মতোই গলাটা ইচ্ছে করে ভেঙ্গে বেসুরো করে দিলো চার্লি। হেসে গড়িয়ে লুটোপাটি খেলো দর্শকরা। আনন্দে হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই। মঞ্চের ওপরে শুধুই ঝনঝন শব্দ উঠলো—টাকা আর পয়সা পড়তেই থাকলো কিছুক্ষণ ধরে। চার্লির মা এলেন ওকে নিয়ে যেতে, মা ও ছেলেকে একই সংগে জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি জানালো। এম্নি করেই চার্লির জীবনের স্মরণীয় রাতটি, রঙ্গমঞ্চে ওঠার প্রথম রজনীটি শেষ হলো। চার্লির হলো শুরু আর মায়ের হলো শেষ।

শীত জাঁকিয়ে আসার সংগে সংগে চার্লিদের অবস্থা আরও খারাপের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। চার্লির মায়ের আশা ছিলো গলা সেরে উঠবে শীগগীরই। কিন্তু দুর্ভাগ্য! শীত বাড়ার সংগে চার্লির মায়ের গলা আরও বেশী খারাপ হলো। গলা সারবার কোনো লক্ষণ নেই। মায়ের জমানো টাকা ছিলো যা—একটু একটু করে সব ফুরিয়ে গেলো। গেলো সব গয়নাগাঁটি—সোনাদানা। দামী দামী যা কিছু আসবাবপত্র ছিলো তাও গেছে। বন্ধক রাখতে হয়েছে। তবুও সংসার চলতে চায় না, চার্লির মা যদিও আশায় আশায় দিন গোনেন···সুদিন আসবে···গলা ভালো হবে··আবার আগের মত গান করতে পারবেন···টাকা আসবে, সংসার স্বচ্ছল হয়ে উঠবে······

কিন্তু স্বপ্ন নিছক স্বপ্নই থেকে যায়। গলা সারে না। আর তিন ঘরের সাজানো বাসা ছেড়ে দু'ঘরের বাসায় উঠে আসে চার্লিরা। চার্লির বাবার নামে আদালতে মামলা করেন চার্লির মা। খরপোসের টাকা আদায় করতে। কিন্তু কোন সুরাহা হয়না। চার্লির বাবার পক্ষের উকিল আর্মস্ট্রং চতুর উকিলী প্যাঁচে সব ভেস্তে দেয়। এদিকে দারিদ্র্য অক্টোপাসের আলিঙ্গনে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে চার্লিদের। দু ঘরের বাসা ছেড়ে অবশেষে একঘরের বাসাতে ঠাঁই নেওয়া হয়। এক এক করে কমতে থাকে ঘর-গেরস্থালির জিনিসপত্র। পাড়া-পড়শীদের কাছেই ওসব বেচে দেন চার্লির মা। এমনিকরে বাসা বদলের সংগে সংগে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম হতে থাকে চার্লিরা। লোকেরা ওদের গরীব বলে।

আর পাঁচজন গরীব লোকের মতই চার্লির মায়ের শেষ অবলম্বন হয়ে ওঠে ধর্মকর্ম। গরীব লোকেরা যা অন্ধের মত আঁকড়ে ধরে সরল বিশ্বাসে। হয়তো বা চার্লির মায়ের ধারণা হয়েছিলো যে ভগবানের অসীম করুণাতে তাঁর গলার স্বর আবার ঠিক হয়ে যাবে। প্রত্যহ নিয়ম করে গীর্জায় যেতেন। ওয়েস্টমিনিস্টার সাঁকোর কাছের গীর্জাতে। রবিবারে চার্লিকেও নিয়ে যেতেন মা। অর্গ্যানে বাজতো

বাথ। সুরমূর্চ্ছনায় কেঁপে কেঁপে উঠতো সারা ঘর। রেভারেণ্ড এফ. বি, মের্থারের ভরাট গম্ভীর থমথমে স্বরে গমগম করে উঠতো সারা গীর্জা-ঘর। উপাসন করার ভঙ্গীতে বসে থাকতেন চার্লির মা। নীরবে বেয়ে পড়তো অশ্রুধারা দু চোখ বেয়ে। মায়ের চোখের জল ঢেউ তুলতো চার্লির বুকে। কেঁদে কঁকিয়ে উঠতো চার্লির মন।

গরম কাল। একদিনের ঘটনা। প্রার্থনা শেষে রূপোর গ্লাশে সবাইকে দেওয়া হচ্ছিলো আঙুরের মদ। যে যতো খেতে পারে—যে যতো চায়। সুস্বাদু সেই আঙুরের রস পুনরায় নেবার জন্যে চার্লি ব্যস্ত হয়ে উঠলে—ত্রস্ত গলায় ব্যাকুল হৃদয়ে হাত টেনে ধরলেন চার্লির মা। মদকে খুবই ভয় পেতেন ওর মা। মদই চার্লির বাবাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। সংসার ভেঙ্গে গেছিলো—চার্লির বাবার মদ খেয়ে পয়সা ফুঁকে দেবার জন্যই।

এদিকে মায়ের অভিনয় জগত ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো চোখের সামনে থেকে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তাঁর থিয়েটারের বান্ধবীদের কাছ থেকে। দুঃখ আর দারিদ্র্য তখন চার্লিদের গায়ে গন্ধের মত লেগে থাকতো। গোধূলির ম্লান বিষণ্ণ আলোর মত আনন্দহীন একঘেয়ে ক্লান্তিকর এক ধূসর জীবন কাটছিলো ওদের। চার্লির মায়ের ছিলোনা লেখাপড়া বা অন্যান্য শিক্ষা—অভিনয় করা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না তিনি। কাজ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে উঠছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে দুচার দশদিনের জন্য দাইয়ের কাজ পেতেন। সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে এক অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন চার্লির মা। তিনটে মানুষের পেট চালানো কি সোজা কথা! সেলাইয়ের কাজে চার্লির মায়ের হাত ছিলো খুবই পাকা। থিয়েটারের সাজ-পোশাক, গীর্জার পাদ্রীদের আলখাল্লা সেলাই করে বা বানিয়ে দিয়ে মাঝেসাঝে সামান্য কিছু রোজগার হতো তাঁর। চার্লির বাবা ছেলেদের ভরণপোষণের জন্য সপ্তাহে দশ শিলিং করে দিতেন। ইদানিং সেটাও অনিয়মিত হয়ে বন্ধ হতে চলেছে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে

নেশা করে, চার্লির বাবা খুবই খারাপ অসংলগ্ন অভিনয় করে চলেছিলেন দিনকে দিন। অভিনয়ের কদর কমছিলো—ধীরে ধীরে তিনি এগোচ্ছিলেন পড়তি ঝড়তি অভিনেতাদের দিকে।

সব গেছে। থাকার মধ্যে রয়েছে টিনের এক তোরঙ্গ। তাতে থিয়েটারের সাজপোশাক ভর্তি! ওটা ছিলো চার্লির মায়ের প্রাণ। বুক দিয়ে আগলে রাখতেন ওটাকে। কোন কোন অলস দুপুরে বা ক্লান্ত সন্ধ্যায় চার্লির মা গভীর মমতায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতেন সব পোশাক-আশাক। হাকিমের টুপি, মোজা, পোশাক, নকল এক প্রস্থ দাড়ি-গোঁফ। গানের সংগে অদ্ভুত অনবদ্য নাচে চার্লির মা অভিনয় করে দেখাতেন চার্লিকে। তোরঙ্গ হাঁটকে বের করে আনতেন হ্যাণ্ডবিল, নাটকের বিজ্ঞাপন। অনেক অনেক পুরনো দিনের নাটকের বিজ্ঞাপন। যখন তাঁকে লোকে চিনতো: হাস্যরসিকা, সুযোগ্যা রূপবতী অভিনেত্রী নৃত্যগীতপটিয়সী লিলি হারলি।

আবেগে অনুভবে বর্ণনায়—প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে, সে সময়কার বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় বহু-বহু নকল করে দেখাতেন চার্লির মা। এলেন টেরি, জো এলভিন আর উইলসন ব্যারেটের অভিনয় পর্যন্ত। চার্লির অভিনয় শেখার হাতে খড়ি তার মায়ের কাছ থেকে। কোন অভিনেতার অভিনয়ে কোথায় কতটুকু শিল্পবোধ রুচিবোধ দক্ষতা বা গুণাবলী রয়েছে—সব কিছু সুন্দর করে সহজ করে, চার্লিকে বোঝাতেন, দেখাতেন, শেখাতেন তার মা। সে সব ঘটনার কথা সারাজীবন মনে ছিলো চার্লির। কোনদিনই ভোলেনি। অভিনেতা হবার পেছনে চার্লির মায়ের শিক্ষার প্রতি চিরঋণী থেকেছে চার্লি বিশ্ববরেণ্য হয়েও। বারবার মায়ের শেখানোর নৈপুণ্যতার স্মৃতিচারণ করেছে বহু ক্ষেত্রে। মা ছিলেন চার্লির জীবনের অনেক অনেকখানি।

॥ তিন ॥

একদিনের ঘটনা।

চার্লির জ্বর হয়েছে, একটু কমের দিকে। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছে। ঘরে শুধু চার্লি আর মা। সিডনি নেই। সে গেছে রাতের স্কুলে পড়তে। দিনের বেলা সিডনি বেচতো খবরের কাগজ। গীর্জা থেকে দিতো খাবারের কুপন। কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন কাটতো। সব সময়েই নুন আনতে পানতা ফুরানোর মত অবস্থা। ওই অবস্থাতেও সন্ধ্যাবেলায় গভীর বিশ্বাসে আর আন্তরিক উচ্চারণে মা পাঠ করতেন বাইবেল। বেছে নিতেন গরীব অসহায় অসুস্থ আর শিশুদের প্রতি প্রভু যীশুর ভালোবাসার বিশেষ অংশবিশেষ। এক অনবদ্য ব্যাখ্যা আর পাঠের অনুরণণে গৌরবান্বিত মনে হতো চার্লির মাকে। মায়ের পড়ার গুণে যীশুকে যেন অনুভব করতো, প্রত্যক্ষ করতে পারতো চার্লি। যীশুর কষ্টে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতেন যেন চার্লির মাও। চোখে জল এসে যেতো তাঁর। কেঁদে ফেলতেন। কাঁদতে কাঁদতেই পড়তেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলতো চার্লিও। ঘন বিষাদের কুয়াশাতে ঢেকে যেতো চার্লির মনটাও। কিছুই ভালো লাগতো না তখন। মাকে বলতো বেঁচে থেকে লাভ নেই—মৃত্যুই ভালো। মা বাধা দিয়ে ধমকে দিতেন চার্লিকে। বোঝাতেন, ঈশ্বরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা বড়ই পবিত্র। প্রভু যীশু চান, চার্লি যেন বেঁচে থাকে—তার সব ইচ্ছাই যেন বেঁচে থাকার বয়সে পূর্ণ হয়। অদ্ভুত সেই নির্দেশ। যা

চার্লি কোনদিনই ভুলতে পারেনি। এক উজ্জ্বল আলোক শিখার মতই যা তার হৃদয়ে গাঁথা হয়েছিলো আমৃত্যু। যা তাকে ভাবতে শিখিয়েছে প্রেম, করুণা আর মানবতার শাশ্বত সত্যকে।

সমাজের নীচু তলার লোকের মতই নিম্ন মানের জীবন কাটে চার্লিদের। অশালীন অভদ্র কথাবার্তা মিশে পড়ে বাচনভঙ্গিতে। কিন্তু মায়ের তীক্ষ্ণ নজর সব দিকে। তীব্র আপত্তিতে ফেটে পড়েন তিনি। অভাব যতই আসুক না কেন—ভদ্রতা সভ্যতার মান খোয়াতে তিনি নারাজ। ব্যাকরণ বোঝান, সংশোধন করে দেন কথা, শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব ও বুঝিয়ে দেন। নিজেদের কিছুতেই হেঁজিপেঁজির দলে মিশে যেতে দেবেন না। একদিন যে চার্লিরা সম্ভ্রান্তশালীন ছিলো সে কথা ভুলতে দিতেন না। কিন্তু এদিকে অভাবের পাঁকে দিন দিন ডুবে যাচ্ছিলো চার্লিরা।

খুব কমদিনই খাবার জোটে সকালে। কচিৎ চার্লি ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেতো চুল্লীতে টিমটিম আগুন জ্বলছে। উনুনের ওপর কেটলী বসানো। কাঠের আগুনে রুটি সেঁকা হচ্ছে আর মা একমনে রুটিতে মাখন মাখাচ্ছেন। মায়ের ঘরে উপস্থিতি, শীতকালে ঘরের কবোষ্ণ তাপ, কেটলীতে জল ফোটার সোঁ সোঁ আওয়াজ আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে কমিক বইয়ের ছবির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চার্লির খাবারের ঘ্রাণ নেওয়ার দৃশ্যটা কেটে গেছে বহুদিন। মাঝেমধ্যে অবিশ্যি অন্যরকম দিন ও আসে। চার্লিকে চা করে দেন মা, রুটি সেঁকে দেন, সংগে কয়েক টুকরো মাংস আর ঝোল। আয়েশ করে খেতে থাকে চার্লি। মা পাশে বসে বই পড়ে শোনান। আবৃত্তি করেন কবিতা আর মজার মজার ছড়া। চার্লি মুগ্ধ হয়ে শোনে।

শীত এগিয়ে এলো শক্তভাবে। এদিকে সিডনির কোন গরম

পোশাক নেই। মা তাঁর পুরনো ভেলভেটের জ্যাকেট কেটে সিডনিকে বানিয়ে দেন কোট। চার্লি পরে মায়ের একজোড়া মোজা। স্কুলে গেলে সব ছেলেরা সিডনিকে খ্যাপাতো অদ্ভুত কোট পরার জন্য। চার্লিকেও ছাড়তো না। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক বলে বিদ্রূপ করে ডাকতো। দুয়ো দিতো। ছেলেরা মজার ছড়াও বানাতো চার্লিকে নিয়ে।

এরই মধ্যে চার্লির মায়ের ধরলো মাথাধরার রোগ, ভয়ংকর যন্ত্রনাতে ছটফট করতে থাকেন। সেলাইয়ের কাজ বন্ধ হয়। অন্ধকার ঘরে চোখে চা পাতার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পড়ে থাকেন। দিন আর চলতে চায়না চার্লিদের। একদিন এক ঘটনা ঘটলো। ঘুরে ঘুরে বাসে বাসে খবরের কাগজ বিক্রি করতে যেয়ে, বাসের খালি সীটে সিডনি কুড়িয়ে পেলো পেটমোটা এক মানি-ব্যাগ। দৌড়ে বাড়ি এসে মায়ের হাতে গুঁজে দিলো সে ব্যাগটা। ব্যাগের মধ্যে মিললো অনেক খুচরো পয়সা আর সাতটা সোনার গিনি। আর তাতে করে সাত দিনেই সেরে উঠলেন চার্লির মা। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো সবাই। সবার জন্য একপ্রস্থ করে নতুন পোশাক কেনা হলো। হৈ হৈ করে সমুদ্রের ধারে ছুটি কাটানো হলো দিন কতক। চার্লির জীবনে সেই প্রথম সমুদ্র দেখার স্বাদ। সমুদ্রের বিস্তির্ণ জলরাশিকে তার মনে হতো বিরাট এক সচল দৈত্য বলে। পায়ের নীচে বালি। আর জলের ঢেউ এসে হাঁটু অব্দি ছুঁইয়ে দিইয়ে চলে যেতো। জাফরানী রঙের সেই বেলাভূমি—উল্টে থাকা কতকগুলো নৌকো, রঙ বেরঙের তাঁবু আর বড় বড় ছাতা—জোলো আগাছা আর আলকাতরার গন্ধ, সব মিলেমিশে এক স্বপ্নময় স্মৃতি সারা জীবন চার্লির সংগে ফিরতো—চোখ বুজলেই চার্লি দেখতো সেই ছবি। টের পেতো সেই গন্ধ।

কুড়িয়ে পাওয়া ধনের পোদ্দারী শেষ হলো। আবার শুরু হলো সেই

না খেতে পাওয়ার দিন। চার্লির মায়ের শরীর একেবারেই ভালো যাচ্ছিলোনা। ঠিক হলো এবারে সবাই মিলে ল্যামবেথ আশ্রমে চলে যাবে। যারা খেতে পায়না, থাকার আস্তানা ও নেই, তাদের শেষ আশ্রয় হলো সেখানে। কাজের বিনিময়ে খাদ্যের বন্দোবস্ত রয়েছে সেখানটায়।

এরই মধ্যে শেষ চেষ্টা চালালেন চার্লির মা—যাতে আশ্রমে না যেতে হয়। উকিল ধরলেন যাতে চার্লির বাবার কাছ থেকে ঠিকমত খরচ-খরচা আদায় করতে পারেন! কিন্তু উপযুক্ত টাকা দক্ষিনা মিলবেনা জেনে উকিল সাত-পাঁচ কথা বলে কেটে পড়লো। উপরন্তু চার্লির মাকে বিনা ফি-তে পরামর্শ দিলো, সবাই মিলে ল্যামবেথ আশ্রমে গেলে থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধাই হবেনা আর। সরকার থেকেই ভরণপোষনের সব দায়িত্ব নেওয়া হবে। অনেক দুঃখে এ অপমানের পথে যেতে রাজী হলেন তিনি। এছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা ছিলোনা তাঁর কাছে। ছেলে দুটোতো অন্তত দু'বেলা দু' মুঠো খেতে পাবে।

চার

ল্যামবেথ আশ্রমে সময় মত খাবার পাওয়া যাবে ভেবে চার্লি আর সিডনিতো আনন্দে আত্মহারা ! তখন খেতে পাবার মতো উজ্জ্বল আনন্দ ওদের কাছে আর কিছু নয় ! ক্ষুধা যে কি জিনিস চার্লি তা বুঝেছিলো অমল শৈশবেই।

আশ্রমের নিয়মানুযায়ী চার্লি আর সিডনিকে ছেড়ে মা চলে গেলেন মেয়েদের মহলে। ওরা শিশুবিভাগে।

কয়েকদিন পরে কারখানার কাজের পোশাক পরা অবস্থায় মা এলেন চার্লি আর সিডনিকে দেখতে। চার্লি আর সিডনি, হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললো। ছেলেদের বুকে জড়িয়ে মাও কেঁদে চলেছেন। কান্নাও থামে এক সময়। মায়ের ফিরে যাবার সময় গড়িয়ে এলো। আশ্রমের দোকান থেকে কিনে আনা নারকেলের মিষ্টি দিলেন ছেলেদের। মা চলে গেলেন। চার্লি আর সিড়নি বুঝতে পারলো তাদের মা বুড়িয়ে গেছেন—ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। আবার চোখ ফেটে জল এলো তাদের।

অল্প কয়েকদিনের ভেতর চার্লি ও সিডনি আশ্রমের জীবনে, নিয়মকানুনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। চার্লি ছিলো শিশুবিভাগে সবার চেয়ে ছোট। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া সুন্দর চুল। সবাই আদর করতো চুল নেড়ে দিয়ে। আশ্রমে সেই চুল ছেঁটে দেওয়া হলে চার্লির খুব মন খারাপ হলো।

তিন সপ্তাহ পরে ওদের হ্যানওয়েল অনাথ বিদ্যানিকেতনে নিয়ে

যাওয়া হলো। লণ্ডন থেকে বারো মাইল দূর। চার্লির মনের গভীরে সেই স্মৃতির আলপনা গাঢ় রেখাঙ্কিত হয়েছিলো। ঘোড়ায় টানা রুটির গাড়িতে করে সেই হ্যানওয়েল পৌঁছবার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! অপূর্ব দৃশ্যাবলী! মাইলের পর মাইল শুধুই গমের ক্ষেত। গম পেকে সোনার রঙ পেয়েছে, সারি বাঁধা সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে থাকা ঝাঁকড়া মাথা কাঠবাদাম গাছেরা! আপেল আর ন্যাসপাতি বাগানে পাখিদের কিচিরমিচির গান! বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ! পরে যখনই এরকম গন্ধ পেতো চার্লি, ওর এক নিঃশ্বাসে মনে পড়তো হ্যান'ওয়েল যাত্রার পথ-দৃশ্যাবলী……

হ্যানওয়েলে পৌঁছে ওদের নিয়ে গেলো অনুমোদন বিভাগে। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হলো। মানসিক সুস্থতার পরীক্ষানিরীক্ষা ও চললো। তারপরে ওদের ভর্তি করে নেওয়া হলো স্কুলে। সেখানে চার্লির সংগে ছাড়াছাড়ি হলো সিডনির। চার্লি ছোটদের সঙ্গে আর সিডনি গেলো বড়দের সংগে থাকতে। দুজনের দেখাশোনা প্রায় বন্ধ। চার্লি তখন সবে ছয় পেরিয়েছে। ভারী একলা লাগে সব সময়—কান্না পায় যখন তখন ওর। এক ধরনের দুঃখ আর বেদনা বোধ ঘিরে ধরে চার্লিকে। বিশেষ করে সন্ধার আগে, মেঝেতে অন্যান্য ছেলেদের সংগে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করার সময়টা। গোধূলিতে অস্তগামী সূর্যের শেষ লালচে আভাতে প্রার্থনা গান চলতো। সব কথার অর্থ না বুঝেও সুরের দোলাতে আন্দোলিত হতো চার্লির মন। একাকীত্ব আর দুঃখ জমতো চার্লির মনে।

দেখতে দেখতে দুমাস কেটে গেলো। একদিনের ছুটিতে চার্লির মা ওদের নিতে এলেন। হ্যানওয়েল থেকে ওরা গেলো ল্যামবেথে মায়ের কাছে। নতুন পোশাক পরে অভ্যর্থনা জানালেন ওদের মা। হাঁটতে হাঁটতে সবাই মিলে গেলো মাইলখানেক দূরের কেনিংটন পার্কে। সিডনির কাছে ছিলো এক পেনী সঞ্চয়। কেনা হলো আধ পাউণ্ড কালো জাম। বেঞ্চিতে বসে দুভাই তাই খেলো তারিয়ে

তাড়িয়ে। করিৎকর্মা সিডনি করে ফেললো ফুটবল খেলার আয়োজন! খবরের কাগজ কুড়িয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে তৈরি হলো বল।. তিনজনে মিলে চললো খেলা। সবাই মিলে খেলো কফি আর দু পেনী দামের কেক একটা করে। আবার পার্কে ফিরে এসে দুজনের খেলাধূলো চললো। দূরে বেঞ্চিতে বসে কুরুশ বুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওদের মা।

দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেলো একদিনের ছুটি। ওরা পুনরায় ফিরে গেলো হ্যানওয়েল স্কুলে।

হ্যানওয়েল স্কুলে চার্লির এক বছর কাটলো। চার্লি শিখলো অনেক কিছু। শিখলো নিজের নাম লিখতে। গোটা গোটা অক্ষরে লিখতো 'চ্যাপলিন'। তাকিয়ে থাকতো মুগ্ধ চোখে। এ যেন নিজেকেই দেখা।

যদিও হ্যানওয়েলে যত্ন আত্তির অভাব ছিলোনা তবুও ভালো লাগতোনা চার্লির। মাঝে মাঝে ছাত্রদের বাইরে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হতো সার বেঁধে। গ্রামের লোকেরা ঠাট্টা করে ওদের বলতো, বোকা তৈরীর কারখানার ছাত্র। আশ্রম—স্কুলে চার্লিকে সবাই চিনতো সিডনির ছোটভাই বলে। সিডনি তখন রান্নাঘরে কাজ করার দায়িত্ব পেয়েছে। চার্লির ভারি মজা! দেখা করতে গেলেই পুরু করে দেওয়া মাখনের পুরসমেত রোল খেতে পাওয়া যেতো। চার্লির কাছে সে খাওয়াটা ছিলো বিলাসিতার মতন। একা খেতোনা—বন্ধুর সংগে ভাগ করে খেতো।

হ্যানওয়েলের ভেতরকার কাণ্ড কারখানা ছিলো ছিমছাম সাজানো। খেলাধূলোর ছ-সাত কাঠা মাপের উঠোন, একতলা একটানা একটাই বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। কোনটা অফিস ঘর। কোনটা ডাক্তারখানা, কোনটা বা ভাঁড়ার ঘর, কোনটা পোশাক-

পোশাক রাখার ঘর। কোনটা দাঁতের ডাক্তারের চেম্বার আর সবার শেষে এককোনে ছিলো ফাঁকা একটা ঘর। কেউ কোন অন্যায় করলে তাকে সেই ঘরে আটকে রাখা হতো। শুক্রবার দিনটি ছিলো বিচারের দিন। ষাট ফুট লম্বা আর চল্লিশ ফুট চওড়া জিমন্যাস্টিক শেখবার ঘরটা ছিলো বিচারশালা। শুক্রবার সকালে সাত থেকে চোদ্দ বছরের শ'তিনেক ছেলে সার বেঁধে কুচকাওয়াজ করতে করতে মিলিটারী কেতাতে ঘরে ঢুকে দাঁড়াতো। ঘরে থাকতো মস্ত বড়ো এক টেবিল। দোষী ছাত্রকে দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে—শার্ট খুলে খালি গা করানো হতো। তারপর বার্চ গাছের ডাল বা লিকলিকে বেত দিয়ে তিন থেকে ছয় ঘা বেত মারা হতো। অবসর প্রাপ্ত নাবিক ক্যাপ্টেন হিনড্রাম সুনিপুনভাবে এ কাজটি করতেন খুশী মনেই।

চার্লির সবে সাত পেরিয়েছে। সে এখন বড়দের দলে। স্বচক্ষে শাস্তি দেখা তার কপালেও ঘটলো।

একটি বিচ্ছু ছেলে নাকি বেপরোয়াভাবে জানালা বেয়ে দোতলার ছাদে উঠেছিলো, লাফ মেরে পাঁচিল টপকে আশ্রম থেকে পালাবে বলে। দুরন্ত সেই ছেলেটির কিন্তু ছোট্টখাট্টো চেহারা। বার্চ গাছের ডাল দিয়ে পরপর তিন ঘা মার খেয়েও একটু কাঁদলোনা সে। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ডাক্তারখানাতে।

শাস্তি জুটলো একদিন চার্লিরও। অভিযোগটা যদিও ছিলো মিথ্যে। কলঘরে আগুণ জ্বেলে কাগজ পোড়ানোর অভিযোগ। চার্লি তখন ছিলো পায়খানাতে। অন্য কয়েকটি ছেলে অবশ্য পাথরের মেঝেতে আগুন জ্বেলে কাগজ পুড়িয়েছিলো ঠিকই—দোষটা পড়লো গিয়ে চার্লির ঘাড়ে। চার্লি অদম্য কৌতূহলে দোষ অস্বীকার করলোনা —মাথা পেতে নিলো সব। মনের মধ্যে কী হয়, কী হয়, ভয় ভয়, ভাব। যথারীতি তিন ঘা বেত পড়লো পিঠে। কোন কথা না বলে, একটুও

না কেঁদে, দাঁতে দাঁত চেপে সেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করলো বালক চার্লি। জ্ঞান হারালোনা সে। মনের মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করবার আর জয়লাভের প্রচণ্ড এক উন্মাদনা এলো তার। ডাক্তারখানাতে নরম গদীর ওপরে শোয়ানো হলো চার্লিকে—ডাক্তার লাগালেন আয়োডিন। অসহ্য সে জ্বালা করাকেও অসাড়ভাবে শুয়ে, টুঁ-শব্দটি না করে, হটিয়ে দিতে পারলো চার্লি।

ওদিকে সিডনি আগে থাকতে এসবের কোন খবর পায় নি। সে সারাদিন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকে—বিকেলে খেলতে আসারও সময় পায়না। শুক্রবার শাস্তিঘরে চার্লিকে শাস্তি পেতে দেখে রাগে ওর শরীর কাঁপছিলো—দুঃখে নেমেছিলো চোখের জল। আশ্রমের নিয়ম হলো এগ্যারোতে পা দিলেই সৈন্যবিভাগ বা নৌবিভাগে যোগ দিতে হবে ছেলেদের। সিডনি নাবিক হতে চায়, এক্সমাউথ জাহাজে সিডনি গেলো শিক্ষানবিশীর তালিম নিতে। চার্লি হয়ে গেলো একলা। একেবারে একা।

এদিকে আশ্রমে দাদের উপদ্রব দেখা দিলো। ধরে ধরে সবার মাথা ন্যাড়া করে চালান করে দেওয়া হচ্ছিলো নির্জন বন্দী ঘরে। দাদ আবার মাথাতেই বাসা করতে পছন্দ করে—চার্লির মাথাতেও দাদ হলো। অত সুন্দর ঘন কোঁকড়ানো চুল বাদ হলো। মনের দুঃখে চার্লির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর থামতে চায় না। একলা ঘরে বন্দী হলো চার্লি।

এর ভেতর চার্লির মা নতুন বাসা নিলেন। কেনিংটন পার্কের ঠিক পেছনে। হ্যানওয়েলের পাট চুকিয়ে চার্লি চলে এলো মায়ের কাছে। সিডনিও এক্সমাউথ ছেড়ে চলে এলো। কয়েকদিন খুব ভালো চললো। খেয়ে পরে সুখে থাকার দিন হঠাৎই শেষ হলো। মায়ের জমানো টাকা শেষ। নতুন কাজও জোটাতে পারলেন না কিছু। আবার বাসা বদলাবার খেলা চললো। চার্লির বাবার কাছ থেকেও কিছু পাওয়া গেলো না। তাঁরও মন্দা সময়—অভিনয় বন্ধ।

সামনের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো। চার্লিরা সবাই আবার গিয়ে উঠলো আশ্রমে। চার্লিদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো নরউড স্কুলে। যে স্কুলের কোথায়ও একটু খুশী বা আনন্দের ছোঁয়া নেই।

একদিনের ঘটনা। স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলছিলো সিডনি। দুজন নার্স সিডনিকে ডেকে খবর দিলো ওদের মা পাগল হয়ে গেছেন। আছেন কেনহিল পাগলগারদে। শোনার পর এতোটুকু বিকার এলো না সিডনির মনে। সে আবার খেলতে শুরু করে দিলো। খেলা শেষে বেঞ্চিতে বসে কাঁদছিলো সিডনি। চার্লি এলো। একে একে জানলো সব। মা—ওদের প্রিয় মা পাগল হয়ে গেছেন কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে মন মানে না ওদের।

চার্লির বুকের মধ্যে দম বন্ধ করা এক চাপা বাতাস যেন আর্তনাদ করে ফিরতে লাগলো। চার্লির মনের মধ্যে গুমরে, গুমরে ওঠে শুধু একটি কথা 'মা পাগল হয়ে গেছে—পাগল!' না, কেঁদে কঁকিয়ে আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে উতলা হলো না চার্লি। অভিজ্ঞতা সে বয়সেই তাকে অনেক বেশী শক্ত-পোক্ত করেছে। সমস্ত কান্না শুষে নিয়ে জমাট বাঁধা এক হতাশার ছায়া খেলা করে যায় মনে—কথারা হারিয়ে যায়। বিস্ময় আর বেদনাবোধে মূক-বধির হয়ে যায় যেন চার্লি। মা যেন আস্তে আস্তে দূরে—আরও দূরে—সরতে সরতে চার্লিদের কাছ থেকে হারিয়ে যেতে লাগলেন।

॥ পাঁচ ॥

এদিকে চার্লিদের এক নতুন জীবন শুরু হলো। মামলার রায় বেরুলো। আদালতের বিশেষ হুকুমে চার্লি ও সিডনির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিলেন ওদের বাবা। আশ্রমের গাড়ি করে ওদের পৌঁছে দেওয়া হলো তুশো সাতাশ কেনিংটন রোডের বাড়িটাতে। সেখানে চার্লির বাবা আর সৎ-মা থাকেন। সেখানে আছে ওদের এক ছোট্ট সৎ-ভাইও। টানাটানা চোখে, একমাথা কোঁকড়া বাদামী চুলে ভারী সুন্দর দেখতে!

ভাড়া বাড়ি। তুখানা ঘর। বড় বড় জানলা গলে রোদ ঢুকে পড়ে সারা ঘরে। অনেকক্ষণ খেলে হুটোপাটি করে। পেছনের ঘরে চার্লি আর সিডনীর থাকার বন্দোবস্ত করা হলো। বিছানাটা বড় ছোট তুজনের শোবার পক্ষে। সৎমা লুইজির তুঃখী তুঃখী চেহারা। লুইজি ওদের একদম দেখতে পারে না। সিডনিকে দিয়ে কয়লা আনায়— ভাঙ্গায়। চার্লিকে পাঠায় মাংস আর মুদীর দোকানে।

অনেক রাতে চার্লির বাবা ফিরে এলে, সবাই খেতে বসতো। চার্লি আর সিডনির সংগে মিষ্টি ধরে কথা বলতেন ওদের বাবা। বাবাকে ভীষণ ভালো লেগে গেলো চার্লির। খেতে বসে বাবার প্রতিটি চালচলন, হাবভাব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো চার্লি। বাবা কেমন করে খাবার তুলে মুখে দেন, কলম ধরার মত নরম আলগোছে ছুরি ধরেন, আস্তে আস্তে মাংস কাটেন, গ্লাস তুলে শব্দ না করে জল খান—এসবই চার্লির কাছে দেখার আর শেখার বিষয়। এরপরে আরও অনেক বছর চার্লি তার বাবাকে হু-বহু নকল করতো আনন্দে, মুগ্ধতায়। আর আবিষ্কারের নেশাতে।

সৎমা লুইজির ভয়ে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকে চার্লি। যা বলে মুখ বুজে শোনে। বাসন মাজে। কাপ ডিস ধোয়। কাঁটা চামচ মাজে ঝকঝকে করে। ঘরের মেঝে ধুয়ে সাফ-সুতরো করে। তবুও সৎমা চার্লিকে দেখতে পারেনা। সিডনিতো তার দুচোখের বিষ। সামান্য ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলেই রাগে যেন লুইজির হাড়-পিত্তি অব্দি জ্বলে যেতো। মদ খেলেতো রীতিমত রাক্ষুসীর মত মূর্তি হতো লুইজির। ওর নিজের ছেলেটাও তেমনি—দেখতে অতো সুন্দর, কিন্তু মুখ দিয়ে সদাসর্বদা কুৎসিত গালাগাল বেরুতো। চার্লিতো সেই দেখে ভুলেও গায়েপড়ে কোন কথা বলতে যেতোনা ছেলেটার সংগেও।

সিডনির নামে ফাঁক পেলেই এটা ওটা চার্লির বাবার কানে লাগাতো লুইজি। যদিও সিডনিকে বাবা কিছুই বলতেন না। লুইজি অবশ্য করুনাবশত চার্লির নামে ওর বাবার কাছে কিছু বলতোনা। যতো রাগ সিডনির ওপর। কিন্তু সিডনি তখন বেপরোয়া, সে গ্রাহ্যই করতে চাইতো না লুইজিকে। খেয়ালখুশী মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতো, অনেক রাতে বাড়ি ফিরতো পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। এসেই শুয়ে পড়তো বিছানায়।

কিন্তু চার্লি স্কুল ছুটি হলেই সটান বাড়ি ফিরতো লুইজির ভয়ে। নীরবে ফাইফরমাস খেটে যেতো। লুইজি অবশ্য চার্লি আর সিডনিকে কেনিংটন রোড স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলো। চার্লি যেন বাঁচতো স্কুলে গিয়ে। বাঁচতো লুইজির হাত থেকে। আর পাঁচজন ছেলের সংগে মেলামেশা করে মনে বল পেতো—নিজেকে অনেকটা সাহসী মনে হতো।

শনিবার এলেই চার্লির মন খারাপ হতো। বিশ্রী লাগতো সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে বলে। শনিবারে আবার সাত সকালেই মদ নিয়ে বসতো যে লুইজি। ওর দু'একজন বান্ধবী ও আসতো। তাদের কাছে সাতকাহন করে যাতা বলতো চার্লি আর সিডনির

নামে। চার্লিকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতো, চার্লি হয়তো তখন টেবিল মুছছে তোয়ালে দিয়ে বা কাঁটা চামচ ধুয়ে রাখছে।

স্কুলের অন্য ছেলেরা যখন শনিবারের একবেলা ছুটির আনন্দে বিভোর হতো—চার্লি তখন মন মরা হয়ে ভূতের মতই একা একা জেগে থেকেতো বাড়িতে। চুপচাপ শুয়ে পড়তো বিছানায়। আকাশ পাতাল ভাবতো। সময় যেন আর কাটতেই চাইতো না। ঘুমও আসতোনা। অশুভ অনেক আশংকার কাঁটা মনের মধ্যে বিঁধতো। অথচ কতই বা বয়েস তখন চার্লির—আট। চার্লির জীবনের সবচেয়ে বিষাদময় বেদনাঘন দিন ছিলো লুইজির বাড়ীতে থাকাকালীন সময়টা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চার্লির কানে আসতো পাশের বাড়ি থেকে গানের সুর আর বাজনার ঝংকার। উদাত্ত কণ্ঠের পুরুষগলার গান থামলে মেয়েদের কাঁচভাঙ্গা খিলখিল হাসি শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে পড়তো সে। কানে আসতো ফেরিওয়ালার হাঁক—"সমুদ্রের টাটকা ঝিনুক নেবেন—ঝিনুক—ঝিনুকের মাংস—।" মাঝে মাঝে অনেক রাতে চার্লির কানে আসতো পথচলতি মাতালের জড়ানো গলায় রকমারি গান। নির্জন নিঝুম ঘরে একাকী বিছানায় সেই গানের সুর যেন চার্লির হৃদয়কে গভীর অন্তরঙ্গ ভাবনায় অবশ করে ফেলতো। পৃথিবীর গভীরতম সেই দুঃখের গান শুনতে শুনতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়তো চার্লি।

সেদিন শনিবার। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে চার্লি দেখে বাড়ি ফাঁকা। লুইজি, লুইজির ছেলে, বাড়িউলী কেউ নেই। সিডনিতো কখনোই থাকেনা—সে তখন ফুটবল খেলতে ব্যস্ত থাকে। চার্লি ভাবলো তাকে আর কোন কাজ করতে হবেনা। এদিকে দুপুর পেরিয়ে গেলো। বিকেলে হলো— তবুও কারুরই কোন পাত্তা নেই। খিদেতে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার দাখিল হলো চার্লির। রান্নাঘরে গিয়ে দেখলো, একদানা খাবারও কেউ রেখে যায়নি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো, তবু কেউ এলোনা বাড়িতে।

এক জায়গায় বসে থাকলে বেশী খিদে পায় ভেবে চার্লি একটু ঘুরে আসতে গেলো এধার ওধার। বাজার পাড়াতে ঘুরতে লাগলো। রাস্তার দুদিকেই শুধুমাত্র খাবারের দোকান। রান্নাকরা সুস্বাদু খাবার দাবার সাজানো কাঁচের আলমারিতে। মাছ-মাংস থেকে শুরু করে সব। জিভে জল চলে এলো চার্লির। অতি কষ্টে নিজেকে ভুলিয়ে রাখলো খিদের হাত থেকে।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত চার্লি অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে দেখলো দরজা বন্ধ। কেউ আসেনি তখনও। সামনের রকে বসে ক্ষুধা তেষ্টা আর ক্লান্তিতে যেন ভেংগে পড়লো চার্লি। সিডনিও তখন ফেরেনি। বাবাতো এম্নিতেই দেরী করে ফেরেন। একে একে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেলো চার্লির চোখের সামনে। টালমাটাল পায়ে বাড়ি ফিরছে সব মাতালেরা। শুধু চার্লির কানে এলো পানশালা থেকে ভেসে আসা সুরের মুর্চ্ছনা। এক অন্ধ বাদক হারমোনিয়াম বাজিয়ে চলেছে। তার অপর অন্ধ সংগী বাজাচ্ছে ক্ল্যারিনেট। চার্লি যে চেনে তাদের!

অনেকক্ষণ পরে লুইজি এলো। সংগে ছেলে। একটু পরে এলো বাড়িউলী। চার্লি ভেতরে ঢুকতেই লুইজির চীৎকারে বাড়ি ফেটে গেলো যেন। দূর দূর করে সে চার্লিকে তাড়িয়ে দিলো বাড়ি থেকে, ঘরে ঢুকতে দিলোনা কিছুতেই। চার্লি নেমে এলো রাস্তায়। বাবার প্রতীক্ষায় ওষুধের দোকানের রকে বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর চার্লির বাবা এলেন। চার্লি কেঁদে ফেললো বাবাকে সব বলতে গিয়ে। পরে বাবা চার্লির হাত ধরে তাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। লুইজির সংগে চার্লির বাবার খুব একচোট ঝগড়া হলো। না খেয়েই কোন-রকমে বিছানায় শুয়ে পড়লো চার্লি।

আরও একবার সারারাত চার্লি আর সিডনি বাড়ির রকে শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলো। লুইজি বাড়ি ঢুকতে দেয়নি ওদের। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দরজা খুলিয়ে ওদের ভেতরে ঢোকায়।

চার্লির মা পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেলেন। ভালো হয়ে গেছেন। নিতে এলেন চার্লি আর সিডনিকে। চার্লি আর সিডনিকে অবাক করা হাসি হাসি মুখে বিদায় জানালো লুইজি। কেনিংটন ক্রসের পেছনে এক আচারের কারখানার পাশে চার্লিদের নতুন বাসা। সস্তা ঘর। সারাদিন আচারের টক-টক গন্ধে থাকা। ওদের মা আবার ব্যস্ত হয়েছেন সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে। মোটামুটিভাবে চমৎকার কাটছিলো চার্লিদের দিন। চার্লির বাবা দশ শিলিং অনুদান পাঠিয়ে যাচ্ছিলেন নিয়মিত। মা আবার নতুন উদ্যমে নিয়মিত গীর্জায় প্রার্থনা করতে যেতে লাগলেন। সে সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনা চার্লির মনে দাগ কেটে বসেছিলো। যা কিনা পরবর্তী জীবনে ও চার্লিকে ভাবিয়েছিলো তার কাজে। মজার দিক আর দুঃখের দিক—চার্লির ছবিতে ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার। ব্যথার দিক আর আনন্দের দিক।

চার্লিদের বাড়ির রাস্তার শেষ প্রান্তে ছিলো একটি কসাইখানা। দলে দলে ভেড়ার পাল নিয়ে যায় কসাইয়েরা। একদিন একটা ভেড়া দল ছুট হয়ে পালাতে চাইলো যেন মৃত্যুর হাত থেকে। মরার ভয়ে শুধুই ছুটোছুটি করছিলো ভেড়াটা, যাতে ধরা না পড়ে। রাস্তার সব লোকতো কাণ্ডকারখানা দেখে মজা পাচ্ছিলো। হাসছিলো। চার্লিও জানালার ধারে বসে সব দেখছিলো আর হাসছিলো। কিন্তু অবশেষে চতুর লোকজনেরা ভেড়াটাকে ধরে ফেললো। ভেড়াটাকে কাঁধে নিয়ে একজন কসাই চললো কসাইখানার দিকে। ভেড়াটার মৃত্যুর কথা ভেবে কান্নায় ভেংগে পড়লো চার্লি। মাকে অনুনয় বিনয় করে বললো, ভেড়াটাকে যেন না মারা হয়—ছেড়ে দেওয়া হয়!

চার্লির মনে তখন হাজারো জিজ্ঞাসা। মা জানেন শুধু অভিনয়, অন্য কিছু নয়। মায়ের বিশ্বাস চার্লির মধ্যে আছে প্রতিভা। চার্লিকে তাই অভিনয় শেখান হাতে ধরে। স্কুলে 'সিণ্ডারেলা' নাটক হবে খ্রীষ্টমাসের আগে। মায়ের কাছ থেকে ভালো করে সব শিখে নিলো সে;

কিন্তু বেচারা নির্বাচনে পাশ করতে পারলোনা। নেওয়া হলোনা চার্লিকে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল চার্লির।

'কুমারী প্রিসিলার বেড়াল' কবিতাটা আবৃত্তি করে পরে অবশ্য চার্লি স্কুলের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। হৈ হৈ হাসিতে ফেটে পড়েছিলো ছাত্র থেকে মাস্টারমশাই সবাই। সারা স্কুলে এক ডাকে সবাই চার্লিকে চেনে তখন কবিতা বলার জন্য।

কিন্তু পড়াশুনোটা একদম ভালো লাগেনা চার্লির। স্কুলে যেতে ভালো লাগে। ভালো লাগেনা ভূগোল পড়তে। শুধু মানচিত্র আর নকসা। ইতিহাসে শুধু খুনোখুনি আর কুটিলতায় ভরা। অঙ্ক হল রসকষহীন শুকনো—শুধু হিসাব নিকাশে ভরা। চার্লির মনে কোন আগ্রহ হলোনা তাই পড়াশুনোতে। পড়াশুনো টেনে নিয়ে যাবার মত ধৈর্যাই রইলোনা। 'আট খোকার দল'—ল্যাঙ্কাশায়ারের এক ঝুমুর নাচার দল, চার্লি তাতেই ভিড়ে পড়লো। পড়াশুনোতে ইতি পড়লো তখন থেকেই। সত্যি কথা বলতে কি, চার্লিরজীবনে বাঁধাধরা স্কুলের কেতাবী শিক্ষার সুযোগ ঘটেছিলো বড়োজোর বছর আড়াই মাত্র। তার বেশী নয়। অথচ সারা জীবন চার্লিকে পড়াশুনো করেই কাটাতে হয়েছে।

॥ ছয় ॥

চার্লির বাবাই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। অভিনেতা হিসাবে তালিম নিতে পারবে আর মাইনেও পাবে আধ ক্রাউন করে। থাকা-খাওয়া বিনি পয়সাতে। দলের পরিচালক মিঃ জ্যাকসন। আগে ছিলেন স্কুল মাস্টার। পরে এই আট খোকার দল খুলেছেন। প্রথম দিকে চার্লির মায়ের আপত্তি ছিলো চার্লির দলে নাম লেখানো নিয়ে, কিন্তু পরে সব দিক ভেবে মত দিলেন। হয়তো ভবিষ্যতে চার্লি অভিনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

চার্লির বয়স তখন আট পেরিয়ে নয়। ছ-সপ্তাহ রীতিমত তালিম নেবার পর চার্লি মঞ্চে উঠলো নাচতে। সঙ্কোচ আর জড়তাতে হাত-পা সব যেন অবশ হয়ে গেলো—ঘেমে নেয়ে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। মুখ-চোখের কোন অভিব্যক্তি নেই,—যেন পাথুরে মুখ হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে জড়তা কাটিয়ে সহজ স্বাভাবিক-ভাবে একক নাচের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠলো চার্লি।

'আট খোকার দলের জনপ্রিয়তা বেড়েছিলো খুব। লণ্ডনে এক রাত্তিরে দু'তিন জায়গায় অভিনয় করতে হতো চার্লিকে। এদিকে নাচ-গান আর লোক হাসানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো চললো চার্লির। জ্যাকসন আবার পড়াশুনোর ব্যাপারে খুবই কড়া ছিলেন। যেখানে যখন দল যেতো, চার্লি আর দলের ছেলেদের স্কুলে যেতে হতো। অবসর সময়ে পড়াশুনো করতে হতো। তখনই কিছুদিনের জন্য চার্লিদের দলে এলেন বিখ্যাত কৌতুকশিল্পী মূকাভিনেতা মার্সেলিন। কুকুর নিয়ে অভিনয় করতেন তিনি। অথচ চার্লি দুঃখ পেয়েছিলেন পরে এই বিখ্যাত অভিনেতাকে দেখে।

সার্কাসের ক্লাউন সেজে আর পাঁচজন ক্লাউনের সঙ্গে নেচে কুঁদে ফিরছেন। পরে অবশ্য মার্সেলিন আত্মহত্যা করেন নিউইয়র্কে।

চার্লির আর একজন প্রিয় অভিনেতা টি. ই. ডানভিল টেমস নদীর তীরে দাঁড়িয়ে পিস্তলের গুলিতে আত্মহতা করেন।

মার্ক শেরিডান—আর এক কৌতুক শিল্পী, তিনিও খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলের গুলিতে আত্মহণনের পথ বেছে নেন।

হাসিখুশী মজাদার কৌতুকশিল্পী ফ্রাঙ্ক কোয়েন। গলায় খুর চালিয়েছিলেন বেহালার ছড় টানার মত। বাথরুমে রক্তগঙ্গার মধ্যে শুয়েছিলেন। ব্যস! খতম।

চার্লির মনে দাগ কেটেছিলেন কৌতুকশিল্পী জার্মো। জার্মোর শৃঙ্খলাবোধ আর অনুশীলন—অভিনয় চর্চা। অভিনীত চরিত্রের মানসিক বিশ্লেষণ খুব ভালো বুঝতেন জার্মো। জার্মোর চরিত্রের বিশেষ গুণগুলো চার্লি পরে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলো।

চার্লির ভাল লাগতো গ্রিফিথ ভাইদের। হাসাতে আর ট্রাপিজের খেলা দেখাতে জুড়ি ছিলোনা ওদের।

এমিভাবে গ্রিমালদি আর ড্যান লিখো—নিপুন নকলনবিশ ব্রানস্‌বি উইলিয়ামস্ মুগ্ধ করেছিলেন চার্লিকে। চার্লি কিনে ফেললো অলিভার টুইস্ট। ডিকেন্সের কাহিনীর চরিত্র চিত্রন বুঝতে। ব্রানস্‌বি উইলিয়ামসের অনুকরণে চার্লি ডিকেন্সের চরিত্রকে রূপ দেবার চেষ্টা করে যেতো। সবাই খুব প্রশংসা করতো। জ্যাকসনের চোখে পড়ে গেলো একদিন। জ্যাকসন বুঝলেন চার্লি হলো এক দুর্দান্ত প্রতিভা। দলে এলো দুই ব্যায়ামবিদ ছোকরা। তাদের মাইনে ভালো—খাবারদাবারও অনেক ভালো। ডিম আর শূয়োরের মাংস দিয়ে রুটি খায়। মাইনে পায় সপ্তাহে মোট সাড়ে আট পাউণ্ড। আর চার্লি পায় দু পেনী হাত খরচা। ডিম-মাংস চোখে দেখে না। নিকৃষ্ট পাউরুটি আর জেলী খেয়ে দিন কাটে তার।

উচ্চাকাঙ্খার তাগিদে ব্যায়াম চর্চাতে মন ঢেলে দিলো চার্লি।

পরে অবশ্য আছাড় খেয়ে বুড়ো আঙ্গুল ভেঙ্গে শরীর চর্চা বন্ধ হলো হঠাৎই। ব্যায়ামের কসরত দেখানোর আগ্রহে ভাঁটা পড়লো।

শখ হলো হাতের কায়দাকানুন শিখবে। চার্লি তাই বাজার থেকে জমানো টাকা ভেঙ্গে কিনলো চারটে থালা আর রবারের চারটে বল। ভালো কৌতুকাভিনেতা হতে গেলে এসব শিখতে হয়। শুরু হলো তালিম নেওয়া। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই উৎসাহের জোয়ারে ভাঁটা পড়লো। বন্ধ হয়ে গেলো এসব।

লণ্ডনে দল থাকলেই চার্লি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতো। মা দুঃখ করতেন চার্লি ঘুরে ঘুরে, অভিনয়ের খাটাখাটুনিতে রোগা হয়ে যাচ্ছে বলে। অনুযোগ করে চিঠি লিখতেন জ্যাকসনকে। আসলে যত্ন-আত্তি যতটুকু পারতেন বা সামর্থ্যে কুলোতো তাই করতেন জ্যাকসন। লোকটা ছিলো এদিকে খুবই ভালো। মায়ের চিঠি পড়ে রেগে যেতেন জ্যাকসন। চার্লিকে মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকতে বলতেন ক্ষোভ করে। চার্লি পড়তো মুশকিলে।

এর ভেতর চার্লির হাঁপানির টান উঠলো তীব্রভাবে। মা ভয়ে মরে গেলেন চার্লির যক্ষ্মা হয়েছে ভেবে। চিকিৎসার জন্য চার্লিকে ভর্তি করা হলো ক্রম্পটন হাসপাতালে। সব রকম পরীক্ষা করে দেখা গেলো বুকের কোন দোষ নেই। এদিকে হাঁপানির টান বাড়ার দিকে, ক্রমশঃ নিঃশ্বাস নিতে দারুন কষ্ট—বুক যেন ফেটে যায় যন্ত্রণাতে। কম্বল জড়িয়ে গাছগাছড়া মাথায় বেঁধে কোনরকমে কষ্ট থেকে রেহাই পেতো চার্লি। মাঝে মাঝে চার্লির ইচ্ছে হতো বেঁচে থেকে লাভ নেই—তার চেয়ে জানালা দিয়ে লাফিয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভালো।

সিডনি তখন সংসারের খরচ বাঁচাতে থাকতো দাদামশাইয়ের কাছে। চার্লির দাদামশাই ছিলেন পেশায় চর্মকার। নাম চার্লি হিল। আয়ারল্যাণ্ডের কর্ক জেলায় বাড়ি। তবে লণ্ডনের ওয়াল-ওয়ার্থের ইস্ট লেনে জুতো মেরামতের দোকান নিয়েছিলেন।

দিদিমার গায়ে ছিলো বেদের রক্ত। চার্লির মা আর মাসী দুজনে অল্প বয়সেই মঞ্চের অভিনেত্রী হিসাবে জীবন শুরু করেছিলেন। চার্লির মাসী—কেট্ মাসী দেখতে ছিলেন সুশ্রী, ভীষণ মেজাজী। চার্লির মায়ের সঙ্গে দেখা হলেই ঝগড়া করতেন—বনিবনা হতো না।

দারিদ্র্য যেন তখন চার্লিদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রবিবারে, ভীষণ গরীবের বাড়িতেও দুটো ভালো-মন্দ রান্না হতো। গরীবদের ভেতরে ও মাংসের সুরুয়া, কাবাব বা রোস্ট রান্না হতো সেদিন। আর রবিবারেও যারা বাজার করতে পারে না তারা তো ভিখিরি মাত্র। চার্লিরা তখন ভিখিরির পযায়ে পড়ে। বাড়িতে রান্না হয়না রবিবারেও—দোকান থেকে একটু মাংসের ঝোল আর সামান্য তরকারী কিনে আনতে হতো।

এক শুক্রবারে খুব মজা হলো। চার্লির মা পাঁচ শিলিং জিতলেন ঘোড়ার বাজিতে। কিনে আনলেন অনেক জিনিসপত্র। উনুনে ঝলসে খাবার জন্য ষাঁড়ের মাংসের বড় এক টুকুরো আনলেন পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে। এদিকে চার্লিদের উনুন নেই। বাড়িউলীর উনুন থেকে মাংস ঝলসে আনতে গিয়ে মাংসটা একটু ধরে গেলো—পোড়া লাগলো যেন। তবুও মা-ছেলে মিলে তৃপ্তিতে সেই মাংস খেলেন।

এদিকে সিডনি একটা কাজ পেলো। বনে বাদাড়ে ঘুরে ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহ করার কাজ। গ্রামেই থাকে বেশীরভাগ সময়। মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাছোড়বান্দা চার্লির অনুরোধে সিডনিকে বাদ দিয়েই ওরা বেড়াতে গেলো। চার্লির মায়ের এক পুরোনো বান্ধবীর বাড়িতে। ল্যান্সডাউন স্কোয়ারের কোনে বিশাল সেই বাড়ি যেন এক স্বর্গপুরী। বাড়িতে চারজন কাজ করার মহিলা। বাড়ির কর্তা কর্ণেল সপ্তাহে মাত্র দু' একদিন বাড়িতে থাকেন। একজন দাড়িওলা যুবক বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলো তখন। চার্লির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেলো তার। দুজনে বিকেল বেলা গল্প করতে করতে রাস্তা

দিয়ে পায়চারি করে। সঙ্গে থাকতো ভারী সুন্দর দেখতে জমকালো দুই কুকুর।

দাড়িওলা যুবকের পরামর্শমত চার্লিকে রোজ সকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হতো। এতে করে হাঁপানি কমে গেলো চার্লির। চার্লি এখন সুখে আছে। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে। হাত মুখ ধোয়। বাথরুম সারে। কুকুর দুটোকে নিজের হাতে খাওয়ায়। চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাঁধে। এক ডাকে ছুটে আসে দাসীরা। রূপোর থালা বাসনে দুপুরের খাবার খায়। চারিদিকে শুধু সুখ আর আরামের ছড়াছড়ি। চার্লিকে এখন সবাই বড়লোকের ছেলে বলে ভাবে। ঠিক পাশের বাড়িতেই চার্লির সমবয়সী একটি ছেলে ছিলো ওর খেলার সঙ্গী। চার্লি যখন ওর সঙ্গে টেবিলে বসে খেতো—তখন হঠাৎ-ই চার্লির নিজেকে প্রতারক বলে মনে হতো। নিজের গরীব পরিচয় লুকিয়ে জাতে উঠে দামী দামী খাবারদাবার খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে যেতো চার্লি দুঃখে আর লজ্জায়। অতিথি হয়ে থাকতে আর ভালো লাগছিলো না তার। চলে আসার দিন যতই মন খারাপ করুক তবুও মুক্তির স্বাদ যেন পেলো চার্লি। তিন নম্বর পাওন্যাল টেরাসের সেই বস্তি বাড়িতে গরিবীয়ানার আবহাওয়াতে আবার ফিরে এলো মা ও ছেলে।

॥ সাত ॥

সিডনি এখন কাজ নিয়েছে ডাকঘরে। টেলিগ্রাফের খবর বয়ে নিয়ে যাবার কাজ। স্কুলে যাবার পাট চুকিয়ে দিয়েছে। চোদ্দ বছর বয়সেই সংসার চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে। ফুরনে ব্লাউজ সেলাই করার কাজ নিয়েছেন চার্লির মা। এক ডজন ব্লাউজ সেলাই করলে দেড় শিলিং মজুরী। বারো ঘণ্টা লাগে এক ডজন সেলাই করতে। দিনরাত শুধু মেশিনের ঘর্ঘর ; মাথা নীচু করে একমনে জামা সেলাই করে চলেন চার্লির মা। শরীরে চোখেমুখে ক্লান্তির কালো ছায়া— তবুও রাত জাগা চলে। সংসারের অভাব অনটনের যেন শেষ নেই।

ডাকঘরে কাজ করার জন্য যে পোশাকটা আছে—সেটাই সিডনি বাড়িতে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় পরে—ঘুরে বেড়ায়। ওর অন্যকোন জামাকাপড় নেই। ছেলেরা সবাই মিলে সিডনিকে খ্যাপায়। গা থেকে মোটে খুলতোই না সিডনি পোশাকটা। রবিবারে লজ্জায় সিডনি বাড়ি থেকে বের হতো না। শেষে মা কোথা থেকে কীভাবে যেন যোগাড় করলেন আঠারো শিলিং। কিনে ফেললেন সিডনির জন্য জর্জের স্যুট। কিন্তু সোমবার থেকে শনিবারের দুপুর পর্য্যন্ত স্যুটটা একটা দোকানে বন্ধক দিয়ে সাত শিলিং যোগাড় করেন মা। তাতেই সংসার চলে। শনিবারে সিডনির হপ্তা-মজুরী থেকে স্যুটটা ছাড়ানো হয়। রবিবারে সেই স্যুট পরে সিডনি আবার বন্ধুদের কাছে আড্ডা দিতে যায়। ঝাড়া একবছর এমনিভাবে চলেছিলো। পরেই হলো গণ্ডগোল। বন্ধকী দোকানদার স্যুটটার জন্য মাত্র তিন শিলিং দিতে চাইলো। কারণ ততদিনে স্যুটটার আঁশ বেরিয়ে জালি জালি হয়ে

গেছে। চার্লির মা সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিলেন। সাত শিলিং যে তখন ওঁর কাছে বিরাট সম্বল। গোটা সপ্তাহ ওই টাকাতেই চলতো।

এদিকে চার্লির জামাটার তালিতে তালিতে দফাগয়া অবস্থা। সেলাই করার জায়গা নেই। শতচ্ছিন্ন সেই পোশাক পরে ভিখিরির মতই দেখাতো তখন চার্লিকে। চেনাজানা বন্ধুদের সংগে রাস্তায় দেখা হলেই চার্লি বলতো যে, সে ছুতোর মিস্ত্রির কাজ শিখছেতো তাই ছেঁড়া পোশাক পরেই কাজে যাচ্ছে।

একদিনের ঘটনা। চার্লির মায়ের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে সে মোড়ের মাথায় গিয়ে পায়চারী করছিলো। রাস্তায় আড্ডা মারছিলো কিছু ছেলে। চার্লির তালিমারা ছেঁড়া পোশাক দেখে ছোঁড়াগুলোতো চার্লিকে টিটকিরি মারতে শুরু করলো। হ্যা-হ্যা করে হাসতে হাসতে চলে গেলো। রাগে পিত্তি জ্বলে গেলো চার্লির। চার্লির মা তখনই এক বুড়ীকে নিয়ে ফিরলেন। শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক পরা তার। ছোটবেলাতে এই বুড়ী নাকি চার্লিকে কোলে নিয়ে আদর করতো। শুনেতো ঘেন্না লাগলো চার্লির। রাস্তা দিয়ে যত লোক যাচ্ছিলো সবাই অবাকদৃষ্টিতে ওদের দেখছিলো। অথচ এই মহিলা ছিলেন একদিন ডাকসাইটে রূপসী। অতীত দিনের উজ্জ্বল তারকা ইভা লেষ্টক। এখন সে অসুস্থা। থাকার জায়গা নেই। খাবার নেই। কোনরকম সহায় সম্বল নেই। পথে পথে দিন কাটে তার। চার্লিদের বাড়িতে তিন চার দিন ছিলো বুড়ী। যাবার সময় চার্লির মা দিলেন কয়েকটা টাকা আর দু একটা পুরানো জামাকাপড়।

এ সময়ে চার্লিরা ওর মায়ের বান্ধবী শ্রীমতী টেলারের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। মায়ের ধর্মমতে বিশ্বাসী—তাই নামমাত্র ভাড়ায় দোতলার সামনের দিকের বড় ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। মিস্টার টেলারের রুলকাঠ বানানোর ব্যবসা। ছাদের ঘরে তার কারখানা। নিজেই মালিক—নিজেই শ্রমিক।

॥ আট ॥

চার্লির সংগে বাবার শেষ দেখা হয় কেনিংটন রোডের পাশে থ্রি স্ট্যাগ শুঁড়িখানাতে। ওদিক দিয়ে যাবার সময় কি খেয়াল হতে চার্লি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছিলো ওর বাবাকে দেখতে। বাবা ভেতরেই ছিলেন। ওখানে মাঝে মাঝেই যেতেন তিনি মদ খেতে।

চার্লিকে দেখেই খুশীমত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর চোখ। হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন চার্লিকে। চার্লি এগিয়ে গেলো বাবার কাছে এভাবে এমন করে আগে কখনও বাবা তাকে কাছে ডাকেননি। বাবাকে দেখাচ্ছিল ফ্যাকাসে, দুর্বল, ক্লান্ত। চোখ দুটি বসে গেছে। সারা শরীর ফুলে ঢোল। ধরেছে 'শোথ' রোগে। অথচ বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ। মানুষটাকে লাগছে চেহারার চেয়ে দ্বিগুণ বেপে। বোঝা যাচ্ছিল, খুবই কষ্ট হচ্ছে তাঁর নিঃশ্বাস নিতে। কোটের বোতামগুলো কাঁপা কাঁপা হাতে আল্‌গা করে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন চার্লির মায়ের কথা। খবরাখবর নিলেন সিডনির। চার্লি অবাক হলো। বিস্ময়ে গলা বুজে এলো তার। এমন করে আগে কখনও তাদের খোঁজখবর করেন নিতো তার বাবা? চলে আসার সময় চার্লিকে কাছে টেনে আদর করে সস্নেহে চুমু খেলেন গালে। সেই শেষবারের মত চার্লি তার বাবাকে বেঁচে থাকতে দেখেছিল।

এর ঠিক তিন সপ্তাহ পরেই বেহুশ অবস্থায় চার্লির বাবার বন্ধুরা তাঁকে ধরে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। সেণ্ট টমাস হাস-পাতালে। স্বেচ্ছায় যেতে চাননি চার্লির বাবা। তাই মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে জবরদস্তি নিয়ে যেতে হয়েছিল কারসাজি করে। জ্ঞান ফেরার পর প্রতিভাবান্ খ্যাতিমান সেই অভিনেতার বাড়ি ফেরার জন্য কতই

না আকুলি বিকুলি। অথচ আর কি বাড়ি ফিরে যাবার সময় আছে? নিজেকে একরকম হত্যা করেই বলতে গেলে হাসপাতালে এসেছেন। হাঁটুতে ছুঁচ ফুটিয়ে ডাক্তাররা টেনে বের করল ষোল বোতল জল। আরও যে কত জমা আছে শরীরে তার কি কোন ঠিক আছে?

প্রত্যেকদিন গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে মা যেতেন হাসপাতালে বাবাকে দেখতে। ফিরে আসতেন দুঃখ, বিষাদ, ক্লান্তি আর হতাশার থমথমে কালো মুখ নিয়ে। চার্লি জীবনে কোনও দিনঃভুলতে পারে নি তার মায়ের—সেই করুণ মুখচ্ছবির কথা।

একদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে রাগে ফেটে পড়লেন মা। কি —না, ফাদার জন ম্যাকলীন হাসপাতালে গিয়েছিলেন চার্লির বাবাকে দেখতে। অসুস্থ শেষ শয্যায় শায়িত মানুষটাকে কোথায় আশার কথা বলবেন, সান্ত্বনা দেবেন তা নয়, উল্টো, মুখের ওপর বলে দিলেন যে যেমন কর্ম তার তেমনই ফল। চার্লির বাবার কর্মদোষেই আজ তার এই অবস্থা।

বেশীদিন কষ্ট ভোগ করতে হলো না চার্লির বাবাকে। মারা গেলেন তিনি। চার্লিদের তখন এমন অবস্থা যে তার বাবার সৎকার করার মত সামর্থ্য নেই। ঠিকমত খেতেই পায় না ওরা! তার উপর কফিন, কাপড়, ফুল কেনার কথা তো ভাবাই যায় না। মা তখন উপায় না দেখে শিল্পীত্রাণ সংস্থার খয়রাতিনেওয়ার কথা ভাবলেন।

বাবার আত্মীয়স্বজনরা আগে কখনও খোঁজ খবর করেনি কিন্তু মারা যাওয়ার পর তাঁদের দরদ উথলে উঠল। তাঁদের পরিবারের কি সম্মান নেই? কেন, চ্যাপলিন কি রাস্তার ছেলে যে ত্রাণ সংস্থার খয়রাতি নিতে হবে? প্রবল আপত্তি তুলল আত্মীয় স্বজনরা।

চার্লির বাবার ছোটভাই আলবার্ট কাকু তখন লণ্ডনে। তিনি সব খরচ জোগাবেন বললেন। তিনি প্রচুর টাকার মালিক। আফ্রিকার ট্রান্সভালে ঘোড়া কেনা বেচার ব্যবসা করেন তিনি। ঘোড়ার

আস্তাবল থেকে দুটো পয়সা তিনি কামিয়ে নিতে পেরেছিলেন। বুয়র যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকারকে তিনি বিস্তর ঘোড়া বেচেছিলেন। ধব্‌ধবে সাদা কাপড়ে মোড়া কফিনের এক কোণে ফ্রেমে আঁটা বাবার ছবি। ছবির নীচে দুধসাদা থোকা থোকা ডেইজী ফুলের রাশি লুইজি পাঠিয়েছে এ ফুল।

টুটিঙ্‌ কবরখানায় চার্লির বাবাকে সমাধিস্থ করা হয়। চার্লি আর তার মা কবর দেবার দুঘণ্টা আগে থেকেই হাজির। কফিনে তোলার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত চার্লির মা দুচোখ ভরে শেষ দেখা দেখলেন, পাশে থাকলেন তাঁর স্বামী চোখের জল ধুয়ে মুছে গেল সব। শুধু আসতে পারল না সিডনিটা। সে তখন রোজগারের ধান্দায় কাজে গিয়েছিল বাইরে। কফিনটা শেষ শয্যায় শোওয়াবার মুহূর্তে আকাশ কালো করে নেমে এল তীরের ফলার মত বৃষ্টি। মাটি গেল গলে। চতুর্দিকে তাল তাল শুধু কাদা। কাঠের কফিনে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে থেঁতলে যাচ্ছে আর শব্দ উঠছে—ধপ্‌ ধপ্‌ ধপ্‌। সবাই ছিটিয়ে দিল ফুল। কবরখানার লোকেরা কফিনের উপর ঠেলে ঠেলে ফেলল কাদা মাটির তাল। চার্লি ডুকরে কেঁদে উঠল। চার্লি বা তার মায়ের দেবার মত তো ফুলও নেই। মা তখন ফিসফিস করে কান্নাভরা গলায় কোনও রকমে বলে উঠলেন চার্লিকে, "তোর গোলাপী সেই রুমালটা দে তো! তাই দিয়ে দিই! তোর আমার দুজনেরই কিছু দেওয়া হবে!" চার্লি হাতে তুলে নিল বৃষ্টিভেজা সেই রুমালটা।

সাঙ্গ হলো সব কিছু। এবার ঘরে ফেরার পালা। সৎকারের অঙ্গ হিসেবে সবাই মিলে ঢুকল এক পানশালায়। সেখানে সবাই মিলে খানা পিনা হলো। খরচ দিলেন আলবার্ট কাকু। গাড়ী করে কাকু চার্লিদের বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিলেন।

দেখতে দেখতে কাটতে লাগল দিন। বাড়তে লাগল চার্লিদের অভাব। মা আর আজকাল তেমন সেলাইয়ে মন দিতে পারেন না।

কোনও কোনদিন ভীষন ক্ষিধেতে পেটের নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে যেতে চায় চার্লির। এমন হয় রান্না ঘরের ডেক্‌চীতে তলানি পড়ে থাকে খানিকটা ঝোল, দু টুকরো ভাঙ্গা আলু। বড় জোর ছোট্ট এক টুকরো মাংস। কিন্তু কি দিয়েই বা খাবে চার্লি। শেষ সম্বল দু পেনী নিয়ে চার্লি গেছে কাজে। তাই দিয়ে কিনবে দুপুরের খাওয়া। চার্লি যখন ক্ষিধেতে অস্থির তখন কানে এলো ফেরিওয়ালার হাঁক— পু-র-নো ভা-ঙ্গা জি-নি-স……। চার্লির মনে পড়ল ঘরে আছে পুরনো ভাঙ্গা একটা স্টোভ, কোনও কাজেই লাগে না। খুশীতে আটখানা হয়ে সেটাই নিয়ে গিয়ে তুলে দিল ফেরিওয়ালার হাতে। দাম মিলল আট পেনী। তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে দোকান থেকে কিনে আনল আট পেনীর'ই রুটি। গব্‌গব্ করে খেল মাংসের ঝোলে ভিজিয়ে সেই রুটি। শান্ত হলো পেট। এম্নিভাবে সর্বদাই যেন পেছনে ফেউয়ের মত লেগে থাকত এক ভয়ংকর শত্রু—তার নাম ক্ষুধা।

বাবার আইনানুগ উত্তরাধিকারী হিসাবে মা নিয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে বাবার ব্যবহৃত জিনিসপত্র তেমন কিছু নয়। রক্তের দাগ লাগা একটা কালো কোট, একটা জাঙ্গিয়া, একটা সার্ট, একটা কালো টাই, বাড়িতে সব সময় পড়ার একটা ঝোলা গাউন মত। এছাড়া বাড়ীতে বাবার কয়েক জোড়া চটী। আর সেই চটী নাড়াচাড়া করতে গিয়েই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একটা চটীর গোড়ালিতে আটকে ছিল শুকিয়ে যাওয়া লেবুর কোয়া। চার্লি যেই না লেবুর কোয়াটা খুলতে গেল অমনি ঘট করেই মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল সোনার একটা আটমোহর। সে কি আনন্দ চার্লিদের। এ যেন সবই ভগবান নিজের হাতে করেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অন্ততঃ কয়েক দিন পেট ভরে রুটি মাংস খাওয়া যাবে।

চার্লি আর স্কুলে যায় না। সামর্থ্য নেই। নিজের তাগিদেই বন্ধ করে দিল স্কুল যাওয়া। নানান্ ধরণের ফন্দী ফিকির মাথায় গজগজ

করে তার, কিভাবে দুটো পয়সা রোজগার করা যায়। ক্ষিধে পেলে খাওয়া যায় অন্ততঃ। বাবা মারা যেতে জামার হাতায় আটকে রাখল কালো কাপড়। শোকের চিহ্ন। কি খেয়াল হতেই মার কাছ থেকে এক শিলিঙ চেয়ে নিয়ে বাজার থেকে কিনে ফেলল দু তিন বাণ্ডিল নার্শেসাস ফুল। এক পেনী দামের থোকাতে ভাগ ভাগ করে বেঁধে ফেলল সব ফুল। শুরু হলো ফুল বেচা। শুঁড়িখানাতে গিয়ে মেয়েদের সামনে গিয়ে ফুল নিয়ে দাঁড়ায় চার্লি। মেয়েরা বাবা মারা গেছে জেনে ফুলতো কেনেই উপরন্তু বাড়তি কিছু পয়সাও চার্লির হাতে গুঁজে দেয়। শেষ থোকাটাও বিক্রী হয়ে গেল। চার্লির মা তো অবাক! সব শুদ্ধু রোজগার হয়েছে পাঁচ শিলিঙ। মায়ের কথার জবাব না দিয়ে চার্লি শুধু মুখ টিপে হাসে। এম্নি করেই চার্লির নেশা ধরে গেল রোজগারের। চালিয়ে গেল তার ফুলের ব্যবসা। কিন্তু না, ধরা পড়ে গেল একদিন মায়ের কাছে। শুঁড়িখানায় ফুল বিক্রি করে বেরিয়ে আসার মুখে হাতেনাতে ধরা পড়ল। মা তখন বাড়ি ফিরছিলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়! চার্লি কিনা তাঁর ছেলে হয়ে শুঁড়িখানায় মাতালদের কাছে ফুল বেচে পয়সা রোজগার করবে? না না, প্রাণ থাকতে, বিবেক থাকতে তিনি সেই পাপের পয়সায় খাবেন না। তাঁর কাছে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে "মদ খাওয়া। নেশা করা পাপ।" মদ চার্লির বাবাকে খেয়েছে। সংসার তছনছ করেছে। তাই মদের দোকানের পয়সাতে তাঁদের ভাল হতে পারে না এটা তিনি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন। বালক চার্লির কাছে মায়ের আদেশ ছিল বেদবাক্যের মত। মা,ই তো চার্লির জীবনে সব। বন্ধ হলো চার্লির ফুল কেনা বেচা।

না ফুল আর বেচে না চার্লি। কিন্তু যখন সে রাস্তা দিয়ে হাটে পথের ধারের রকমারি জিনিসপত্রের দোকান দেখলেই সে ভাবতে থাকে ব্যবসার কথা। হয়ত হঠাৎ চোখে পড়লো একটা খালি দোকান —ভাড়া দেবে। অমনি চার্লির মাথায় গজগজিয়ে উঠল নানা রকম

ভাবনা চিন্তা! উফ্, এখানে যা ভাজাভুজির দোকান হবে না! চপ্, কাটলেট, ফ্রাই কিংবা মাছের দোকান! অন্ততঃ আর কিছু না হলেও মুদীর দোকান তো হবেই। চার্লি তখন বুঝতে শিখেছে ব্যবসা যদি করতেই হয় তবে খাবার-দাবারের ব্যবসা! একেবারে মারমার কাটকাট। খেতে তো সকলকে হবেই! চার্লি যে নিজের জীবন দিয়েই সেটা শিখেছে! কিন্তু ব্যবসা করতে যে টাকা লাগে। টাকা কোথায় পাবে চার্লি? শেষে অনেক ভেবে ঠিক করলো চাকুরী করে সে পয়সা জমাবে। তাই দিয়েই ফেঁদে বসবে এক জমজমাট খাবার দাবারের ব্যবসা।

জীবনের প্রথম চাকরী এক স্টেশনারী দোকানে, ফুট ফরমাসি খাটার কাজ। তেল, সাবান, নানারকম বিস্কুট, সাগু, বার্লি, খেলনা, কাগজ, পেন্সিল থেকে ছুঁচ পর্য্যন্ত বিক্রি হয় দোকানে। নানা রকম জিনিস থরে থরে সাজানো থাকে! সুযোগ পেলেই চার্লি খাবার দাবার কোন্‌টার কেমন স্বাদ একটু চেখে দেখে। আর এই পরখ করে দেখতে গিয়েই চার্লির পেট ছেড়ে ছিলো। বেশ কয়েকদিন কামাই হলো। ব্যস্ অমনি চাকরীও খতম। মনে মনে নিজেকেই গালাগাল করে চার্লি। কেন যে ছাই খাবার দাবার চাখতে গেলাম।

সিডনি হচ্ছে কর্মিৎকর্মা ছেলে। সে বয়সেই কত রকম যে কাজের খোঁজ রাখে। সিডনির তদ্বির তদারকিতে চার্লির চাকরী জুটলো এক ডাক্তারের চেম্বারে। মাইনে ভালো। সপ্তাহে বারো শিলিং। চার্লির কাজ হলো ডাক্তার আসার আগেই চেম্বার খুলে সব সাফসুতরো করা। টেবিল চেয়ার দরজা জানালা সব মুছে ঝক্‌ঝকে তকতকে করে রাখা। অপেক্ষামান রুগীদের দেখাশোনা করা। খাতির করে গোমরামুখো রুগীদের বসানো, মজার কথা বলে তাদের হাসানো। বেশ চলছিলো। কিন্তু অসুবিধে হলো একটা ব্যাপারে। রুগীরা পরীক্ষার জন্য দিয়ে যেতো মল, মূত্র, থুতু, কফ। চার্লির বিন্দুমাত্র লজ্জা ঘেন্না হতো না এসব নিয়ে নাড়াঘাটা করতে। কিন্তু মুশকিল হলো

দশ ফুট উঁচু জানালা পরিষ্কার করা নিয়ে। অত উঁচু জানালার নাগাল পেতো না চার্লি। পরিষ্কার করা হতো না—একটু একটু করে জমে উঠতে লাগলো ধূলো ও নোংরা। ব্যাপারটা নজরে পড়লো ডাক্তারের। বাচ্চা ছেলে চার্লিকে দিয়ে কাজ চলবেনা ভেবে ডাক্তারবাবু মিষ্টি কথায় বরখাস্ত করলেন তাকে। চার্লিতো কেঁদে কেটে সারা। এতো সাধের চাকরীটা চলে গেলো। দেখে খুবই দয়া হলো, মায়া এলো ডাক্তারের। ডাক্তার কিন্‌সেটলর্ বিয়ে করেছিলেন বিরাট বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে। বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলেন ল্যাংকাস্টার গেটের কাছে মস্ত বড় এক অট্টালিকা। খুচরো ফাই ফরমাস খাটার কাজ পেলো চার্লি সে বাড়িতে।

দিব্যি আরামে বালক-ভৃত্য চার্লির দিন কাটে সে বাড়িতে। বাড়ির অন্য সব কাজের মেয়েরা খুবই ভালবাসে চার্লিকে। রাতে শুতে যাবার আগে চার্লির কপালে আদর করে চুমু খায়। চার্লির তখন ইচ্ছে হয় একদিন সে সুন্দর পোশাক পরা খানসামা হয়ে উঠবে। একদিনের ঘটনা। বাড়ির গিন্নী চার্লিকে ডেকে বল্লেন ভাঁড়ার ঘরের তাক পরিষ্কার করতে। ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা একগাদা কাঠের বাক্স সরাতে গিয়ে চার্লি দেখলো আটফুট লম্বা এক লোহার নল। ভেরী বাজানোর মতোই নলে ফুঁ দিয়ে গমগমে ভরাট আওয়াজ বের করার খেলায় মেতে উঠলো সে। চার্লিতো মনের আনন্দে ফুঁ দিয়ে শিঙ্গে ফুঁকে চলেছে, ওদিকে গিন্নীতো চার্লির কাণ্ড দেখে রেগে আগুন! তিন দিনের নোটিশে চার্লির চাকরীর দফারফা হয়ে গেলো।

এক চুল-দাড়ি কাটার সেলুনে কাজে লাগলো চার্লি। নাপিতের কাজে সাহায্য করে। ব্রাস ধুয়ে দেয়। সাবানের বাটিতে ব্রাস ঘষে, ফেনাময় ব্রাস বুলিয়ে খদ্দেরের দাড়ি নরম করে দেয়। বয়স আর

অভিজ্ঞতা কম বলে দাড়ি কাটার অনুমতি মেলে না ওর। তবে মাঝে মাঝে খদ্দেরের মাথা ন্যাড়া করার কাজে হাত পাকায় চার্লি। হঠাৎ করে সে কাজও চলে গেলো—চার্লির বয়স কম বলে।

সিডনি তখন খবর আনলো বইপত্র আর খবরের কাগজের দোকানের এক চাকরির। ডাব্লিউ. এইচ. স্মিথ এণ্ড সনের দোকানে। চাকরি করতে বেশ ভালোই লাগছিলো চার্লির। কিন্তু বড় কর্তা ধরে ফেললেন চার্লির সত্যিকারের বয়েস। বয়েস ভাঁড়িয়ে ঢোকার জন্য এবারেও চাকরি গেলো চার্লির।

স্কুলে থাকতে কাঁচের নল গরম করে ফুঁ দিয়ে ফোলানোর ভারী মজাদার খেলা খেলতো চার্লি। কাঁচের কারখানায় মাত্র একদিন কাজ করেছিলো সে। গরমের ভাপে দম আটকে কাজ করতে করতেই অজ্ঞান হয়ে গেলো চার্লি। বালির বস্তার ওপরে অসুস্থ চার্লিকে শুইয়ে রাখা হলো। একটু সুস্থ হলে কারখানার লোকেরাই ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সেঃ শেষ। এমনকি সেই একদিনের মাইনে নিতেও আর ওমুখো হয়নি চার্লি।

চার্লির যাতায়াতের পথে পড়তো স্টোকারের সেই বিখ্যাত ছাপাখানা। কুড়ি ফুট লম্বা দৈত্যের মত বিশাল মেশিনটা যখন চলতো চার্লি অবাক বিস্ময়ে বহুদিন বাইরে দাঁড়িয়ে তা দেখতো। একদিন ওর চোখে পড়লো একটা লটকানো নোটিশ—"হোয়ার-ফিডেল মেশিনের জন্য অভিজ্ঞ যোগানদার চাই। বালক হলেও চলবে।" দেখেই সটান ভিতরে ঢুকে পড়লো চার্লি। এলেন ফোরম্যান। চার্লি জানালো সে কাজ জানে, কাজ করতে চায়। মেশিনটা চালাতে হলে পাঁচ ফুট উঁচু পাটাতনের ওপর উঠে পা দিয়ে লিভারটা ঠেলে দিতে হয়। আসলে চার্লিতো কাজ জানেনা, তাই যখন। ফোরম্যান বললেন, "লাথি মারতো দেখি। কেমন পারিস।" চার্লিতো বুঝতেই পারলোনা কাকে লাথি মারবে। চোখ বড় বড় করে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে, এধার ওধার করতে লাগলো।

সব বুঝে হেসে ফেললেন ফোরম্যান। চার্লি যে আগে কখনো মেশিনে কাজ করেনি বুঝলেন, তবুও চার্লির কাকুতি মিনতিতে নরম হলেন। সুযোগ দিলেন কাজ করার। চিনিয়ে দিলেন লিভার। শিখিয়ে দিলেন সব। ছোট্ট চার্লি তারপর থেকে অক্লেশে পা দিয়ে লিভার ঠেলে চালু করতো মেশিনটা। উচু পাটাতনে উঠে চার্লির মনে হতো, সে যেন এফিল টাওয়ারের চূড়াতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেশিনটা যখন চলতো তখন দেখতো দাঁত কড়মড় করা ভয়ংকর এক দৈত্য, চিবোচ্ছে—পিষছে—কাগজ। হাঁ করা চোয়ালের ফাঁকে হাতির দাঁতের চিরুণী মতো দিয়ে চার্লি গুঁজে দিতো কাগজ। প্রথম দিনতো ঠিকমতো কাগজ যোগান দিতে গিয়ে ভয়ে ভাবনায় ঘেমে নেয়ে অস্থির হলো সে। সপ্তাহে বারো শিলিং মাইনে ঠিক হলো চার্লির।

ডিমের কুসুমের মত নরম মৃদু আলোর ভোরে বেরিয়ে কাজে যেতো চার্লি। গাছের পাতায় জমে যাওয়া শিশির। নির্জন সেই শীতাতুর পথে ভূতুড়ে ছায়ার মত দু চারজন লোক চোখে পড়তো। সেই সাত সকালেই কেউ কেউ লম্বার্টের দোকানে সেরে নিতো প্রাতরাশ। আরামে চুমক দিতো গরম গরম ধোঁয়া ওঠা চায়ে। চার্লির ভাগ্যে সে সব কিছুই জুটতো না। শুধু সেই নরম শীতের ভোরে পথ চলার আনন্দে সে হাঁটতো ছাপাখানার দিকে।

কাজটা এম্নিতে বেশ মনের মতই ছিলো তার কাছে। শুধু সপ্তাহ শেষে একশো পাউণ্ড ওজনের ভারী ভারী লোহার রোলার নামিয়ে তেল কালি মুছে সাফ সুতরো করে রাখাটা ছিলো খুবই পরিশ্রম আর কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবুও বেশ চলছিলো। কিন্তু তিন সপ্তাহ না পেরুতেই চার্লিকে ধরলো ইনফ্লুয়েঞ্জাতে। সর্দিজ্বরে কাহিল হলো চার্লির শরীর। চার্লির আর কাজে যাওয়া হলোনা। মা মানা করলেন। চার্লিও আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলো। সিডনি ষোলতে পড়লো।

চাকরি পেলো আফ্রিকাগামী জাহাজে। ক্যাসল কোম্পানির এক

যাত্রীবাহী জাহাজ। মাইনে মাসে আড়াই পাউণ্ড। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের খাওয়া দাওয়ার তদারকি আর শিঙে ফুঁকে যাত্রীদের দিনে দুপুরে রাত্রে খেতে ডাকার কাজ সিডনির। মাইনে ছাড়াও রয়েছে উপরি রোজগার বকশিস্। জাহাজ ছাড়ার আগে পঁয়ত্রিশ শিলিং অগ্রিম দেবে কোম্পানি। পুরো টাকাটাই মায়ের হাতে গুঁজে দেওয়া যাবে। সিডনির খাওয়া-পরা আর জামাকাপড়তো বিনি পয়সাতেই মিলবে জাহাজ থেকে। আর ভাবনা কি!

সিডনি ভাসলো জাহাজে। অগ্রিম টাকা পেয়েই চার্লিরা চেষ্টার স্ট্রিটে দুঘরের একটা বাসা নিয়ে উঠে গেলো। নীচেই চুল-দাড়ি কাটার এক সেলুন।

সিডনি ফিরে এলো বাড়িতে। চার্লিদের খুব একচোট হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দের দিন ফিরে এলো যেন। রূপোর টাকাতে তিন পাউণ্ড শুধু বকশিস্ই পেয়েছে সিডনি। সিডনি পকেট থেকে বের করে ঝনাৎ শব্দে বিছানার ওপরে ফেললে চার্লি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এত টাকা এক সংগে সারা জীবনেও সে দেখেনি কখনও। সে যে কী আনন্দ চার্লির। টাকা গড়িয়ে দিচ্ছে, ছড়িয়ে ফেলছে মেঝেতে, কুড়িয়ে নিচ্ছে, গুনছে ·· সে এক এলাহি রাজকীয় ব্যাপার! চার্লির কাণ্ড কারখানা দেখে সিডনি আর মা তো হেসেই বাঁচেন না! দু'জনেই হাসতে লাগলেন। মা বলতে লাগলেন, "চার্লিটা না, ভীষণ কিপ্টে বুড়ো—ও পিঁপড়ে সেদ্ধ করে চিনি বের করতে পারে!" মায়ের কথা শুনে চার্লিতো লজ্জায় লাল। ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকালো।

তখন লণ্ডনে বসন্তকাল। সুখ আর প্রাচুর্যে চার্লিদের দিন কাটছিলো। রোজ রোজ দামী কেক-পুডিং আর আইসক্রীম খাওয়া চলে সবাই মিলে। সকালবেলা জমিয়ে প্রাতরাশ! কত কি থাকে খাবার প্লেটে! ধূমায়িত হেরিংমাছ ভাজা, কড মাছের চচ্চড়ি, ডিম-দুধ-ময়দার তৈরি চেপটা বড়াভাজা, হেরিং মাছের শুঁটকির ঝোল,

ঝাঝরা মত দেখতে নরম সুস্বাদু পিঠে। এছাড়া থাকতো সেঁকা পাউরুটি সংগে মার্মালেড, মাখন, জ্যাম জেলীর সুস্বাদু আয়োজন। যত খুশি খাও, কুছ পরোয়া নেই। আহা! কতদিন পরে পেটপুরে চারবেলা খেতে পারছে চার্লিরা। সবার শেষে চায়ের পটে মা ভেজাতেন ভারতীয় দামী চা। ঘরের বাতাস সুগন্ধে ম-ম করে উঠতো।

এদিকে বেশী আইসক্রিম খেয়ে সিডনির ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হলো। এক পেনী দিলেই এক গামলা আইসক্রীম দেয়। চার্লিতো বাড়ির সবচেয়ে বড় গামলাটা নিয়ে যেতো আইসক্রীম কিনতে। আইসক্রীমে দুধ জমিয়ে খাওয়া চলছে। চার্লিকে যেন আইসক্রীম খাওয়ার এক নেশায় পেয়ে বসেছিলো। সব সময়ে আইসক্রীম খেতে ব্যস্ত।

এদিকে সিডনির টাকা শেষ হয়ে গেলো। জাহাজ থেকে ডাক এলো সিডনির। দ্বিতীয়বার জাহাজ ছাড়ার আগেও সিডনি অগ্রিম পেলো পঁয়ত্রিশ শিলিং। কিন্তু তিন সপ্তাহও চললোনা সেই টাকাতে। চার্লিদের তখন খরুচে অভ্যাস হয়ে গেছে। ওদিকে সিডনির ফিরে আসতে তখনও তিন সপ্তাহ বাকী। সংসার চালাতে মা আবার মেশিনে সেলাই নিয়ে পড়লেন। কিন্তু সেই সামান্য আয়ে কিছুই হতে চায়না। আবার সেই অভাব আর হাহাকার।

বিপদে পড়লে চার্লির আবার চটপট বুদ্ধি খুলে যায়। চার্লির মায়ের ছিলো অনেক পুরনো পোশাক আশাক। পুরনো দিনের স্মৃতি—যখন তিনি মঞ্চে অভিনয় করতেন। অনেক কষ্টে মাকে রাজী করাতে পারলো চার্লি। সবগুলো বিক্রি করে দিতে রাজী হলেন তিনি। এক শনিবারের সকালে নুইংটন বাটের ফুটপাতে হরেকরকম সেই পুরানো জামাকাপড় নিয়ে বেচতে বসলো চার্লি। ফেরিওয়ালাদের মত সুর করে চেঁচিয়ে সে খদ্দের হাঁকতে লাগলো। ছোট্ট চার্লিকে দেখে আর তার চীৎকার শুনে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়লো, দেখলো নেড়েচেড়ে কিন্তু কিনলোনা। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো কিন্তু

একটাও বিক্রি হলনা চার্লির। এদিকে অস্বস্তির একশেষ। উল্টো দিকের গয়নার দোকানের লোকেরা মজা পাওয়া চোখে চার্লিকে দেখছিলো। চার্লি তাকালেই বারবার ওদের কারুর না কারুর সংগে চোখাচুখি হয়ে যাচ্ছিলো। স্যাঁকরার দোকান থেকে গুটিগুটি পায়ে একজন লোক বেরিয়ে এলো। বোধহয় রাশিয়ান। ভাঙ্গা ইংরেজিতে সে চার্লির কাছ থেকে জানতে চাইলো কতদিন ধরে এসব বিক্রি করছে চার্লি। চার্লি যখন জানালো সেদিনই প্রথম হাতেখড়ি দিয়েছে, তখন সে হাসতে হাসতে বিষম খেলো। এদিকে বিক্রির হাল খুব খারাপ। এত হাঁকডাক করেও একজোড়া পায়ে পরার পট্টিমত বিক্রি করে মাত্র ছ পেনী পেলো চার্লি। আর বসে থেকে লাভ নেই। চার্লি সব গুটিয়ে বাড়িমুখো হলো। মায়ের হাতে টাকা দিতেই মার কি আপশোস! আরো অনেক দাম পাওয়া যেতো! চার্লিটা নির্ঘাৎ ঠকে এসেছে। কী ডাঁহা ঠকান ঠকে এসেছে! ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ঠকিয়েছে।

বাড়ির ভাড়া জমে চলেছে। ভাড়া আদায়কারী লোকটার আসার দিন আগে ভাগেই জেনে নেয় ওরা। সকাল না হতেই ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এম্নি করে বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা এড়িয়ে চলে। আদায়কারী লোকটা ওদের না পেয়ে ফিরে যায়। জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার ঝামেলা অনেক। তাছাড়া তাতে খরচা পোষাবেনা। গাড়ি করে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভাড়া পড়বে, তার চেয়ে চার্লিদের জিনিসপত্রের দাম অনেক অনেক কম হবে।

এর ভেতর বাড়িভাড়া ফাঁকি দিয়ে চার্লিরা উঠে গেছে তিন নম্বর পাওন্যাল টেরাসের বাসাতে। সেখানেই চার্লির সংগে পরিচয় হলো এক বুড়ো আর তার ছেলের। দেশ গ্লাসগোতে। নতুন এসেছে ওরা। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর বাচ্চাদের খেলনা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। থাকে কেনিংটন রোডের পেছনের বস্তিতে। বেশ সুখে আছে ওরা। নাম মাত্র খরচে খেলনা বানায়। চার্লি ওদের সংগে

ভাব জমিয়ে নৌকা বানানো শিখে নেয়। মনে আশা একদিন সে নিজেই নৌকা বানিয়ে বেচবে—টাকা রোজগার করবে। বেশ কিছুদিন পরে সেই খেলনা বেচিয়ে বুড়ো আর তার ছেলে এলাকা ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেলো।

চার্লি অনেক কষ্টে মূলধন বাবদ ছ পেনী জোগাড় করতে পারলো মায়ের কাছ থেকে। জুতোর দোকানদারের ফেলে দেওয়া পিচবোর্ডের বাক্স চেয়ে আনে। ফল চালান আসে কাঠের বাক্সে—কাঠগুঁড়োতে ঢেকে ; ফলওলার কাছ থেকে চার্লি চেয়ে নেয় কাঠের গুঁড়ো। খুশি মনেই ফলওলা এসব দেয়। চার্লিকে শুধু বাজার থেকে কিনতে হয় এক পেনী দামের কিছুটা গঁদ, এক পেনীর হালকা কাঠ, দু পেনী দামের রঙীন গুলিসুতো, এক পেনীর লাল-নীল কাগজ আর দু পেনী দিয়ে তিনটে রঙীন চুমকির গোলা। সবশুদ্ধ খরচ এক শিলিং। তাই দিয়ে সাত ডজন নৌকা বানানো চলবে। প্রত্যেকটা বিক্রি হবে এক পেনী দামে। কিন্তু চার্লি এক সপ্তাহ খেটে বানাতে পারলো তিন ডজন নৌকো। পিচবোর্ড কাটতে গিয়ে হাতে ফোস্কা পড়লো। এভাবে শুরু হলো চার্লির নতুন ব্যবসা।

এদিকে তিন ডজন নৌকোতে সারা ঘর জুড়ে গেলো। চলা ফেরা করা দায়। তদুপরি চার্লির মায়ের আবার জ্বাল দেয়া গঁদের বিচ্ছিরি গন্ধে বমি পায় আঠার বাটিটা চলাফেরার সময় আবার মায়ের জামাতে লাগে—সরিয়ে রাখারও জায়গা নেই। এতো করেও চার্লির ব্যবসাতে লাভ হলো যৎসামান্য। মায়ের আয়ের তুলনায় খুবই নগন্য। খাটুনি খুব। রোদে-জলে-ঠাণ্ডাতে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করা। সবদিক ভেবে নিয়ে খুদে ব্যবসায়ী চার্লি তার ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো।

চার্লির দাদামশায়ের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ ছিলোনা। ইদানিং জুতো সেলাইয়ের কাজে জুৎ পাচ্ছিলেন না। হাতের গাঁটে গাঁটে শূল বেদনা ধরেছে। জুতো সেলাইয়ের ছুঁচটা পর্য্যন্ত ধরতে

পারছিলেন না। এম্নিতে আগে মাঝে মাঝেই চার্লিদের দশ-বিশ টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। বাড়িতে ভালোমন্দ খাবার-দাবার নিজের হাতে রান্না করে, লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। একটা বিচিত্র রান্নার কথা চার্লির দীর্ঘদিন মনে ছিলো। শালগম আর পেঁয়াজ কুঁচি কুঁচি করে কেটে, ঘন দুধে সেদ্ধ করে নিয়ে নুন আর গোলমরিচ মেশানো হতো সেই ঝোল ঝোল খাবারে। দাদু বলতেন, যত ঠাণ্ডাই পড়ুক না কেন এ খাবারে ঠাণ্ডা পালাবে বাপ বাপ বলে।

খুব ছোট থাকতে চার্লি আর সিডনিতো দাদুকে এড়িয়ে চলতো। দেখেই পালাতো। পড়া জিজ্ঞেস করা, ব্যাকরণের ভুল ধরা আর আদবকায়দা শেখানোর বড় জ্ঞান দিতেন কিনা দাদু!

বাতে কাহিল হয়ে দাদু ভর্তি হলেন হাসপাতালে। চার্লির মা সপ্তাহে একবার দেখা করতে যান। বাড়ি ফেরেন এক থলে ডিম নিয়ে। দাদুই দেন। চার্লির দারুণ আনন্দ ডিম দেখে। ডিমতো বড়লোকেরা খায়—গরীবরাতো ডিম চোখেই দেখে না! মা না যেতে পারলে—চার্লি যায় হাসপাতালে দাদুকে দেখতে। বুড়ো ভারী খুশি হন চার্লিকে পেলে। মজার মজার গল্প করেন চার্লির সংগে। নার্সদের সংগেও দাদুর খাতির খুব। শরীর একটু চাঙ্গা হলেই দাদু হাসপাতালে রান্নাবান্নার কাজ নেন। জমিয়ে রান্না করেন। ডিমের জোগান সেখান থেকেই। দেখা করতে গেলেই থলেভরা ডিম তুলে দেন চার্লির হাতে। যদিও দাদু চার্লিকে বলতেন, কেউ কিছু বলবেনা চার্লিকে ডিম নিয়ে যেতে দেখলেও—তবুও সে জামার নীচে লুকিয়ে রাখে থলেটা। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে দুরু দুরু বুকে হাসপাতালের গেট পেরিয়ে যেয়েই দৌড় লাগায়। যদিও বেরুবার মুখে দারোয়ান, নার্স বা ব্যস্ত ডাক্তার কাউকেই দেখতে পেতো না চার্লি কোনদিন।

চার্লির দারুন আনন্দ তখন! কত রকম রান্না হয় ডিমের। ডিম সেদ্ধ। ভাজা। ওমলেট। পোচ—ডিমের ঝোল। ডিমের হালুয়া। ডিমের কুসুম দিয়ে বড়া। ডিমের ঘণ্ট। এক কথায়

চার্লিদের দিনরাত চলছে তখন ডিমের ওপর। শুধু ডিম আর ডিম। মা একমনে সেলাই করে চলেছেন। জানালাতে বসে হয়তো চার্লি রাস্তার লোকজন দেখছে। ক্ষিধে পেলো ওর। ব্যস্, সংগে সংগে উঠে নিজেই তৈরি করে ফেললো ছটা ডিম ভেঙ্গে ঢাউস পেট—মোটা এক ওমলেট। মাতো হেসেই ফেললেন চার্লির রকম সকম দেখে। লাজুক চোখে চার্লি তখন ওমলেটে কামড় দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু চার্লির কপালে ডিমের সুখের উত্তাপ বেশীদিন সইলো না। বাতের ব্যাথা সেরে গেলো দাদুর। তিনি হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে গেলেন। তাঁকে এতো তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যেতে দেখে খুবই দুঃখিত হলো চার্লি।

এদিকে দেখতে দেখতে ছ সপ্তাহ কেটে গেলো। তবুও সিডনির ফিরে আসার নাম নেই। নেই কোন চিঠিপত্র। চিন্তায় উদ্বেগে অস্থির হলেন মা। খোঁজ নিলেন জাহাজ কোম্পানির অফিসে। খবর পেলেন, পথে বাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে সিডনি। তখন তাকে নামিয়ে দেওয়া হয় কেপটাউনে। ওখানকার হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সিডনির। বিপদের উপর বিপদ বাড়লো। অশান্তি জাপটে ধরলো মাকে। দিনরাত শোনা যেতে লাগলো মেশিনের ঘর্ঘর যান্ত্রিক শব্দ। মাকে দেখাতো ক্লান্ত বিধ্বস্ত নুয়ে পড়া। স্থির থাকতে না পেরে বালক চার্লি অতি কষ্টে জোগাড় করে ফেললো এক কাজ। নাচ শেখানোর কাজ। মাইনে সপ্তাহে পাঁচ শিলিং।

ঠিক তখনই ম্যাকার্থিরা কেনিংটন রোডে এলো। চার্লির মায়ের বান্ধবী মিসেস ম্যাকার্থি ছিলেন এককালের বিখ্যাত অভিনেত্রী। স্বামী মিঃ ম্যাকার্থি ছিলেন ব্যস্ত হিসাব নিরীক্ষক। প্রচুর টাকা রোজগার ওঁর। ওঁদের ছেলে ওয়ালির সংগে চার্লি চোর-পুলিশ খেলতো। বড়দের মত মিছিমিছি সিগারেট খাওয়ার খেলা খেলতো—মুখে শব্দ করে কল্পনায় ঘোড়ার গাড়ি চালাতো। বাড়ির পেছন দিকের

বাগানে নাটক নাটক খেলতো ওরা। চার্লি অবশ্য নাটকের পরিচালক হতো। আর খল নায়কের চরিত্র বেছে নিতো। অভিনয়ের দাপটে হার মানিয়ে দিতো নায়ককে। খাবার সময় হলে ওয়ালির সংগে চার্লিকেও খেতে ডাকা হতো। চার্লির কিন্তু খেলার সময়েও মন পড়ে থাকতো কখন খেতে ডাকা হবে—খাওয়ার জন্যইতো খেলতে আসা ওর। তখনতো বাড়িতে প্রায়দিনই কোন খাবারদাবার থাকে না। কোন কোন দিন অবশ্য চার্লিকে খেতে ডাকেন না ওয়ালির মা। ম্লান মুখে বিষণ্ণ চোখে চার্লি ফিরে যায় বাড়িতে। ওর মা, ঘরে যা থাকতো বা জুটতো তাই তাড়াতাড়ি চার্লির মুখের সামনে ধরে দিতেন। বড়জোর সেঁকা পাউরুটি—একটু চিনি ছড়ানো। এক কাপ চা। মাঝেমধ্যে ওর দাদুর পাঠানো ডিমের ঝোল বা গাজরের হালুয়া ও জুটতো। খাওয়ার পরে চার্লিকে গল্প বলতেন মা। বই থেকেও কিছু পড়ে শোনাতেন, যাতে ওর মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। কখনও বা জানালার পাশে চার্লিকে নিয়ে বসতেন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া বিভিন্ন লোকজনদের নিয়ে মজার মজার মন্তব্য করতেন। আর গল্প ফেঁদে বসতেন। চার্লি তাঁর মায়ের এই বিশেষ ক্ষমতা দেখে অবাক হতো খুবই। অনুপ্রাণিত হতো মায়ের এই উদ্ভাবনী শক্তিতে। বানানোর ক্ষমতা এম্নি করেই অঙ্কুরিত হয়েছিলো চার্লির মনে।

সপ্তাহ দেড়েক কেটে গেলো।

সিডনির চিঠিপত্র আসার নাম নেই। মা যেন কেমন বদলে যেতে লাগলেন। বিবর্ণ ব্যথাতুর চোখে যেন এক পাথর প্রতিমা তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার ধারে বসে থাকেন চুপচাপ। সেলাইয়ে আর মন নেই। জামা সেলাইয়ে অনেক গলতি হতে থাকে। অনুযোগ করে শার্ট বানাতে দেওয়া দোকানদারেরা। কিন্তু মায়ের যেন তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, বিকার নেই। চার্লির চোখের সামনে কেমন যেন হয়ে যেতে লাগলেন মা। চার্লিকেও আর কাছে

ডেকে আদর করেন না। কথা বলেন না। গল্প করেন না। চার্লি মায়ের মন পাওয়ার জন্য ওঁর চতুর্দিকে ঘুরঘুর্ করে। তবু্ও মায়ের সেদিকে যেন খেয়ালই নেই। বেদনায় দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। বালক চার্লির চোখ ফেটে জল আসে। এদিকে নাচ শেখানোর কাজটাও বন্ধ হয়ে গেছে। চার্লির পাঁচ শিলিং রোজগারের পথটা ও থেমে গেলো। এক অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো চার্লিদের পরিবার।

আবার হঠাৎ করেই খুশিতে ঝলমল হয়ে উঠতেন মা। চার্লিকে কাছে ডাকতেন। আদর করতেন। যেন আকাশ পাতাল ভাবনার দিন শেষ হলো তাঁর। চার্লির স্কুলে তখন গরমের ছুটি চলছে। সকাল হলেই ওয়ালির সংগে খেলতে চলে যেতো। ইচ্ছে হতোনা মাকে ছেড়ে যেতে। তবু্ও যেতে হতো, মা জোর করে পাঠিয়ে দিতেন চার্লিকে।

সেদিনও ওয়ালিদের বাড়িতে খেললো চার্লি। খেলো। মনটা কেন যেন ছটফট করে উঠলো মায়ের জন্য। খেলা ফেলে রেখেই বাড়ির দিকে ছুটলো। চার্লিদের বাড়ির সামনে তখন বশ ভীড় জমে গেছে। অবাক চোখে বাড়ির দিকে এগোতেই একটি মেয়ে এগিয়ে এলো। চার্লি তার মুখেই শুনলো ওর মা নাকি পাগল হয়ে গেছেন। শুনে সাংঘাতিক রকম ধাক্কা খেলো ও। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বার কয়েক উচ্চারণ করলো—'পাগল !—পাগল ! বলে। সেদিন দুপুরে চার্লির মা পাড়ার প্রতিটি বাড়ি ঘুরেছেন। হাতে এক থলে কয়লা। সবার ঘরে যেয়েই নাকি বলেছেন, "এই নাও ভাই—তোমার ছেলের জন্মদিনের কেক।" হাতে গুঁজে দিয়েছেন এক টুকরো কয়লা। স্তম্ভিত চার্লি এক লাফে তিন চারটে সিঁড়ি টপকে সোজা দোতলায়, দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। বিকেলের পড়ন্ত রোদে ছিলো ম্লান বিষণ্নতা। ঘরের মধ্যে তখনও রোদের আঁকিবুঁকি। জানালার

ধারে বসে যেন এক নিঝুম্-নিরালা পুকুরে ডুব দিয়েছিলেন মা। এ দৃশ্য যে চার্লির ভীষণ চেনা। চার্লি মাকে ডাকলো। সাড়া দিলেন মা। চার্লি নিজেকে আর সামলাতে পারলো না। মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ছোট্ট শিশুর মত কেঁদে ভাসিয়ে দিলো। কান্নাতে ভেঙ্গে পড়লো সে। মা যতোই জিগ্যেস করেন চার্লি, কাঁদছে কেন— চার্লি ততোই বলে, 'মা তোমার কি হয়েছে?' মা উত্তরে বলেন, তাঁর কিছুই হয়নি। তিনি ভালোই আছেন। পাড়াতে সবার বাড়ি বাড়ি কয়লা নিয়ে মা ঘুরেছিলেন কেন জানাতে চাইলে মা বল্লেন যে, তিনিতো সিডনির খোঁজ করতে বেরিয়েছিলেন। পাড়ার লোকেরা যে সিডনিকে লুকিয়ে রেখেছে। ওরা যে সিডনিকে কিছুতেই তাঁর কাছে আসতে দিচ্ছেনা।

চোখের জলের ভেতর দিয়েই চার্লি এটা বুঝতে পারলো যে, ওর মা সত্যি-ই পাগল হয়ে গেছেন। লোকেরা যা বলছে সেটাই সত্যি। কোন রকমে গলার ভেতরকার কান্নার দলাকে দমন করে চার্লি মাকে বলতে পারলো যে সে মায়ের জন্য ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে। মা চার্লির কথার কোন জবাব না দিয়ে স্বগতোক্তির গলায় বলে উঠলেন, "আমি জানি কারা লুকিয়ে রেখেছে আমার সিডনিকে। এ নিশ্চয়ই শয়তান ম্যাকার্থীদের কাজ!"

এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে মায়ের কোল থেকে উঠে দাঁড়ালো চার্লি। ডাক্তার ডাকার কথা ভাবলো—সিঁড়ি দিয়ে এক ছুটে নেমে গেলো নীচে।

বাড়িউলির সংগে দেখা। সান্ত্বনা দিলেন তিনি চার্লিকে। ততক্ষণে ডাক্তার ডাকতে লোক চলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার এলেন। পাড়ার বুড়ো রগচটা ডাক্তার। মাকে পরীক্ষা করেই বল্লেন যে, হাসপাতালে পাঠাতে হবে দ্রুত। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অনেকদিন ধরে আধ-পেটা খেয়ে, শরীর আর মনের অপুষ্টিতেই মাথার গোলমালটা বেঁধেছে।

বাড়িউলি চার্লিকে জানালেন যে হাসপাতালে ভর্তি হলে তবুও তো চারবেলা পেটভরা খাবার জুটবে চার্লির মায়ের।

বাড়িউলিই ছোট্ট এক চামড়ার স্যুটকেসে পোশাক আশাক টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলেন। জামা ছাড়িয়ে বাইরে যাবার পোশাক পরিয়ে দিলেন মা কে। বাড়ির বাইরে মাকে ধরে ধরে নিয়ে বেরোতেই—পাড়ার ছেলে বুড়ো মেয়েরা বড় বড় অবাক চোখে চার্লি আর ওর মাকে দেখছিলো। পাগলকে দেখে যেমন করে লোকে; ঠিক তেম্নি ভয় আর বিস্ময়ের আঁচড় ওদের চোখে মুখে। বড় কষ্ট পেলো চার্লি এ দৃশ্য থেকে।

শেষ বেলাকার রোদে মায়ের কোমর আঁকড়ে ধরে আছে চার্লি। দুর্বল পায়ে মাতালের মত টলতে টলতে এক হাতে চার্লির কাঁধে ভর দিয়ে পথ চলছিলেন মা। রাস্তার পথচারীরা মজা পাওয়ার চোখে দেখছিলো মাকে। ভাবছিলো নেশায় বেহুঁশ হয়েই মায়ের পা টালমাটাল। কিন্তু চার্লির মায়ের যেন এসব কোন কিছুতেই নজর নেই। সম্পূর্ণ নির্বিকার আর নিরাসক্তভাব তাঁর চোখেমুখে।

হাসপাতালে তরুন এক ডাক্তারবাবু ভালো করে পরীক্ষা করলেন মাকে। পাড়ার বুড়ো ডাক্তারের চিঠি আর প্রেসক্রিপশনও খুঁটিয়ে দেখলেন। ভর্তি করে নিলেন মাকে। নার্স মাকে ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে মায়ের চোখে সে কি উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। চার্লি বুঝলো, মা অস্বস্তি আর দ্বিধা নিয়েই যেন ভেতরে ঢুকে গেলেন। বালক চার্লিকে দেখে আরও দুঃখিত হলেন ডাক্তার। জানতে চাইলেন চার্লি এখন থেকে মাকে ছেড়ে কেমন করে কোথায় থাকবে। চার্লি এক মুহুর্ত ভেবে নিয়েই জানালো যে, সে তার ছোট মাসীর কাছে থাকবে।

বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতেই বালক চার্লি জামার হাতায় বারবার চোখের জল মুছলো। চোখের জল যে কিছুতেই হার মানতে চায়না। মনে পড়ে মায়ের মুখ···টুকরো টুকরো সব ঘটনা···স্মৃতিরা

ভীড় করে চোখের সামনে। সারাদিন ঘোরাফেরার পর কাজের ক্লান্তি নিয়ে মা বাড়ি ফিরে আসছেন। দূর থেকে মাকে দেখেই ছুটে যেতো চার্লি আর সিডনি। হাত ঢুকিয়ে দিতো মায়ের বড়ো হাতব্যাগে। চরম দুঃখের দিনেও হাতে উঠে আসতো কিছু না কিছু একটা খাবার। টফি, চকোলেট, কেক বা পেস্ট্রি। একটা সিডনির জন্যে। একটা চার্লির জন্যে। এ ব্যাপারে মায়ের কখনও ভুল হতোনা।

সন্ধ্যা নেমেছে ঘন আঁধারে। এলোমেলো মনে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ হেঁটে চলেছে চার্লি! ফাঁকাবাড়িতে ঢুকতে মন চাইছে না। বাজারের দোকানপাট দেখলো অনেকক্ষণ। বড়ো বেশী ক্লান্ত লাগছিলো ওর। বাড়ি ফিরে এলো। মা ঘরে নেই এ চিন্তাই ওকে যেন অসাড় করে রাখলো অনেকক্ষণ। ঘরে কোন খাবার খুঁজে পেলোনা চার্লি। চায়ের আধ-ভর্তি একটা প্যাকেট আর টেবিলের কোনে চার্লির জন্যে মায়ের এনে রাখা ছোট্ট এক প্যাকেট মিষ্টি। কান্নায় ভেংগে পড়লো ও—কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলোনা।

ঘরের এক কোণে টুলের ওপরে রাখা এক বালতিতে চার্লির দুতিনটে জামা আর মায়ের সেমিজ ভেজানো রয়েছে তখনও। হাত ব্যাগটা পড়ে আছে টেবিলের ওপর—খোলা। তাতে রয়েছে তিনটে আধ পেনী, কয়েকটা চাবি আর অনেকগুলো বন্ধকী রসিদ।

কিছুই খেলোনা চার্লি। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লো এক সময়। সকালের রোদ চোখেমুখে এসে পড়তে ঘুম ভাঙ্গালো ওর। তক্ষুনি মনে পড়লো মা নেই।

বাড়িউলি এলেন চার্লির খোঁজ নিতে। বল্লেন যে, চার্লির কোন ভয় নেই। যতদিন অন্য ভাড়াটে না আসে ততদিন চার্লি ঘরে থাকতে পারবে। বাড়িউলির ওখানেই চার্লি খেতে পারবে দু'বেলা। সকাল বিকালের টিফিনও চার্লি ওখানেই সেরে নিতে

পারবে। চার্লি জানালো যে সিডনি ফিরে এলেই বাড়িউলির সব ধার দেনা শোধ করে দেবে সে।

বাড়িউলি মা কে দেখতে গেলেন। চার্লির যেতে মন চাইলোনা—গেলে বেশী কষ্ট বাড়বে ওর। বাড়িউলি-ই খবর আনলেন যে চার্লির মাকে প্রায় বিশ মাইল দূরের কেনহিল উন্মাদ-আশ্রমে বদলী করা হয়েছে সু-চিকিৎসার জন্য। চার্লির আর মাকে দেখতে যাবার উপায় রইলোনা। ওখানে যাবার গাড়িভাড়া কোথায় পাবে চার্লি? সিডনির আসার আশায় দিন গোনে চার্লি। তখন দু'ভাই মিলে এক সংগে মাকে দেখতে যাবে। বালক চার্লি অপেক্ষা করে চলে—ভাবে মা হয়তো ততদিনে একদম ভালো হয়ে যাবে। সিডনি আর ওর হাত ধরে বাড়ি ফিরে আসবে এক সংগে।

দিন বাড়ে। সপ্তাহ গড়িয়ে যায়। মা হাসপাতালে। চার্লি একা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চোরের মতই যেন চুপিচুপি পালিয়ে যায় চার্লি। বাড়িউলি দেখতে পেলেই যে খেতে ডাকবেন ওকে—তাই বিশ্রামের দরকার হলে পার্কের বেঞ্চিতে বসে বা শুয়ে পড়ে। পকেটে পয়সা থাকলে কম পয়সায় সস্তা কোন কিছু খাবার-দাবার কিনে খায়। পয়সা কোথায় পাবে অত! তাই সারা দিন না খেয়ে থাকা অভ্যাস করে। এ যেন খাদ্যের সঙ্গে কানামাছি খেলা। কোন-কোন দিন সকাল থেকে রাত অব্দি দিব্যি কিছু না খেয়ে কাটিয়ে দেয়। চার্লিকে দেখে যেন ক্ষুধাও ভয়ে পালিয়ে যেতো তখন। যার মা পাগল হয়ে হাসপাতালে, তাঁর ছেলের অত খাই-খাই করা কি চলে! নিজেকেই নিজে ধমকায় চার্লি। শাসন করে। সারাক্ষণ যুদ্ধ করে ক্ষুধা পাওয়ার বিরুদ্ধে।

এভাবেই চার্লির দিন কাটে। সেদিনও অন্য দিনের মত হাতমুখ ধুয়ে দাঁত মেজে ভোর ভোর থাকতেই বাড়ি থেকে কেটে পড়ার তালে ছিল চার্লি। কিন্তু পড়বি পড় বাড়িউলির মুখোমুখি। খপ্ করে চার্লির হাত চেপে ধরেন তিনি, চার্লিকে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে।

অনুযোগ করলেন তিনি, রোজ চার্লি না খেয়ে পালিয়ে বেড়ায় বলে। অনেক দিন পর ডিমভাজা, টোস্ট আর সুস্বাদু চায়ের ঘ্রাণ পেলো চার্লি। বাড়িউলির কথা অমান্য করলো না, বাধ্য ছেলের মত সব খেয়ে নিলো।

এদিকে আরেক চিন্তা। সিডনি যদি তাড়াতাড়ি এসে না পৌঁছায় তাহলে বাড়িউলি ঠিক করেছেন যে চার্লিকে হ্যানওয়েল স্কুল-আশ্রমের কর্তৃপক্ষের হাতেই তুলে দেবেন। চার্লি তাহলে ভাল থাকবে। বাড়িউলির এই ভালো করার ভাবনায় ভীত চার্লি প্রায় দিনই বাড়ি ফিরতো না। পথে ঘাটে পার্কেই কাটিয়ে দিতো। যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতো বাড়উলিকে।

এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতেই কেনিংটন রোডের বস্তির কাছাকাছি দুজন ছুতোর মিস্ত্রীকে মনে ধরলো চার্লির। আলাপও করে ফেললো। লোকদুটো বিশ্বসংসারের খোঁজখবর কিছুই রাখে না। আপন খেয়ালে বড় বড় গাছের গুঁড়ি করাতে চেরাই করে কুড়ুল দিয়ে কাটতো। ছোট ছোট টুকরো করে কাঠের বাণ্ডিল বেঁধে আধপেনী দামে এক এক বাণ্ডিল বাজারে বেচতো।

চার্লি গভীর মনযোগে লোক দুজনের কুড়োল চালানো দেখে। কাঠের শক্ত গুঁড়িতে অবিরাম কুড়ুল পড়েই চলে। শব্দ ওঠে "ঠক্, ঠক্। ঠক্ ঠক।" বয়স দুজনেরই প্রায় চল্লিশের এদিক ওদিক। তবে দেখায় বেশী বুড়ো। এদের মধ্যে যে আসল কর্তা তার রাঙ্গা-মুলোর মত চ্যাপ্টা মোটা নাক আর ওপরের পাটির একটামাত্র দাঁতের হাসি চার্লিকে অবাক করে তুলত। সাক্‌রেদ রোগাটে রোগাটে; ভারি নিরীহ চেহারা। খুবই কম কথা বলে। কর্তা গোছের লোকটি কিন্তু এমনিতে খুবই সাদাসিধে। চার্লি-তো এরই মধ্যে ওদের দুজনের খুদে সাক্‌রেদ বনে গেছে। মাঝে মাঝে কর্তার হুকুমে পনীর দিয়ে রুটি খাওয়া হয় সবাই মিলে। নুন আর গোলমরিচের

গুঁড়ো মেশানো সেই পনীরের অদ্ভুত স্বাদ অমৃতের মতই লাগতো চার্লির কাছে। তার সঙ্গে থাকতো এক কাপ করে কড়া চা। মাইনে পত্র নিয়ে চার্লি কোনও উচ্চবাচ্যই করেনি। তবুও সপ্তাহ শেষে কর্তা হাসিমুখে চার্লির হাতে তুলে দেয় নগদ ছ'পেনী—চার্লির হাত খরচ। আন্তরিকতায় বিমুগ্ধ চার্লির চোখে জল আসে। একদিন চার্লি যখন কোটি টাকা রোজগার করেছিলো তখনও এই মানুষটির বদান্যতার কথা সে ভুলে যেতে পারেনি। অন্য জন—যার নাম জো, মাঝে মাঝে তাকে মৃগী রোগে ধরতো। ফিট হয়ে পড়তো। কর্তা তখন পিজবোর্ড পুড়িয়ে জোর নাকের কাছে ধরতেন। বন্ধ হতো মুখের গ্যাঁজলা ওঠা। খুলে যেত দাঁত কপাটি, উঠে বসতো সুস্থ্য হয়ে। তখন যে কি লজ্জা তার!

এমনিভাবে ভোর সাতটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্য্যন্ত কাঠ চেরাই এর আড়তে, এই দুই ছুতোর মিস্ত্রীর সঙ্গে চার্লির, সময় কাটত। তবুও অত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে মন চাইত না চার্লির। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত, মায়ের অভাব সারাক্ষণ পীড়িত করত।

কর্তা ছিল মানুষ হিসাবে খুবই রসিক। মাঝে মাঝে দু পেনী দামের নাটকের টিকিট কিনে আনতেন সবার জন্য। একবার কিনে আনলেন বিখ্যাত ফ্রেড কার্নোর দলের "আর্লি বার্ডস্" নামক হাসির নাটকের টিকিট। পরবর্তীকালে চার্লি এই নাটকের দলে অভিনয় করেছিল।

কর্তা কিন্তু নিজে ছিলেন পড়াশোনাতে দারুন উৎসাহী। চার্লিকে মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করতেন সে স্কুলে ঠিকমত যায় কিনা, পড়াশোনাতে কোনও ফাঁকি যেন সে না দেয়। কারণ তখন গরমের ছুটি শেষে স্কুল খুলে গেছে। চার্লি তাই স্কুলের সময়টা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটিয়ে দিত। পরে সাড়ে চারটে নাগাদ কাঠের কারখানায় যেত যাতে কেউ সন্দেহ না করে।

রাতের গভীরে চুপি চুপি বাড়ি ফিরে বিছানায় শোয় চার্লি।

ভোর হওয়ার আগেই কেটে পড়ে। সেদিনও শুতে যাওয়ার সময়ই বাড়িউলি এসে চার্লির হাতে গুঁজে দিলেন সিড্‌নির পাঠানো টেলিগ্রাম। পরদিন সকালে দশটা নাগাদ ওয়াটার্ল্ স্টেশনে সিড্‌নি আসছে। চার্লি যেন স্টেশনে যায়।

চার্লির-তো যাওয়ার মত জুতো জামা কিছুই নেই। বাড়িউলির হাত এড়াতে দিনের পর দিন চান করা হয় নি। গায়ে বোঁটকা গন্ধ। শেষ পর্য্যন্ত আঙ্গুল বেরিয়ে পড়া জুতো আর ছেঁড়া নোংরা জামা পরেই স্টেশনে গেল চার্লি। সিড্‌নি তো চার্লির আগা পাশ্‌তলা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্। চার্লি তখন জানালো যে মা গেছেন পাগলা গারদে আর সে নিজে ভিখিরীর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বাসাটা এখনও অবশ্য আছে তাও জানাতে ভুললনা। সিড্‌নি বড়লোকী মেজাজে ডাকলো কুলি। টমটমে ওঠানো হলো মালপত্র। সিড্‌নি এবার সঙ্গে এনেছে বিরাট কাঠের পেটীতে করে এক পেটী কলা। চার্লির ইচ্ছে ছিল তক্ষুণি অত কলা থেকে গোটা চারেক খেয়ে নেয়। কিন্তু কলাগুলো তখনও পাকেনি সিড্‌নি আগের চেয়ে লম্বা হয়েছে রোগাও হয়েছে। বাত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় একমাস কেবা টাউনের হাসপাতালে পড়ে ছিল। ফিরেছে অবশ্য জাহাজেই। মাস মাইনে ছাড়াও বখশিস পেয়েছে কুড়ি পাউণ্ড।

টমটমের ভিতরেই সিড্‌নি চার্লিকে জানিয়ে দিল যে সে আর জাহাজে শিঙ্গে ফোঁকার চাকরী করছে না। অভিনয় করবে, বিরাট অভিনেতা হবে সে। রোজগার করে যা এনেছে তাতে অন্ততঃ কুড়ি মাস হেসে খেলে চলে যাবে দু'ভাইয়ের। লণ্ডনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা থিয়েটারের দল আছে, তাতে কোথায়ও না কোথায়ও ভিড়ে পড়তে পারবে বলে মনে বিশ্বাস আছে সিড্‌নির।

বাড়ির সামনে এসে টমটম থামমেই ছোটখাটো একটা ভিড জমে গেলো। চার্লি আর সিডনি যখন ধরাধরি করে কলার ঝুড়িটা নামালো তখনতো দেখে সবার চোখ ছানাবড়া।

বিকেলে সিডনি চার্লিকে নিয়ে গেলো এক বড় জামা-কাপড়ের দোকানে। চার্লির জন্য কেনা হলো নূতন জামা-কাপড়। এক প্রস্থ স্যুট। দুজনেরই ভেবে খুব আফশোস হলো মা সংগে নেই বলে। দোকান থেকে কেনাকাটা সেরে সিডনি চার্লিকে নিয়ে ঢুকলো এক নামী রেঁস্তোরাতে। গানবাজনা শুনতে শুনতে দুজনে খানাপিনা সারলো। খানাপিনার পর দামী টিকিট কেটে দুজনে থিয়েটার দেখতে ঢুকলো।

দুদিন পরের ঘটনা। মানসিক হাসপাতালের বাইরের ঘরে বসে আছে সিডনি আর চার্লি। একজন নার্সের সঙ্গে মা ঢুকলেন। চিনতে পারলেন ছেলেদের। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই ; সব আবেগ অনুভূতি আর স্নেহমায়া যেন ধুয়ে মুছে গেছে মায়ের মন থেকে। বড় খারাপ হয়েছে তাঁর চেহারা। যাবার সময় নার্সটা অর্থপূর্ণ চোখে জানাতে ভুললোনা যে, ওদের মা এখনও অসুস্থ। ভালো হননি। এখন মাকে বেশী কিছু জিগ্যেস না করাই ভালো।

চার্লি বিষণ্ণ মনে চুপ করে বসে রইলো। সিডনি একাই গল্প করে চল্লো একতরফা। জাহাজের গল্প—অনেক টাকা এনেছে তার গল্প—মার এখন কোন কষ্ট থাকবেনা সেই কথাও জানালো। মা শুধু ঘাড় নাড়লেন। মাঝেমধ্যেই 'হুঁ হাঁ' ছাড়া কিছু বল্লেননা। চলে আসার আগে চার্লি কোনরকমে বললো—"মা তুমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। ভালো হয়ে যাবে। আর কয়েকটা দিন তুমি একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দাও। পরে আবার আমরা সবাই মিলে হৈ হৈ করবো।"

উত্তরে মা বলে উঠলেন, "আমিতো ভালোই আছি। আরো ভালো থাকতাম যদি তুই আমাকে সেদিন এক কাপ চা করে খাওয়াতি…গরম চা…এক কাপ চা…"

রাস্তায় নেমে বাড়িতে ফেরার পথে চার্লির কানে কেবলই মায়ের শেষ কথাটা বাজতে লাগলো…এক কাপ চা…

॥ নয় ॥

ছোটবেলা থেকে যত কাজই করুক না চার্লি; আসলে মনের গভীরে সযত্নে লালন পালন করে চলেছিলো অভিনেতা হবার বীজ।

লণ্ডনে বেডফোর্ড স্ট্রিটের ব্ল্যাকমুরের অফিসের নাম ছিলো থিয়েটারের অভিনেতার যোগানদার হিসাবে। সামান্য কিছু টাকা অবশ্য কাজ পাওয়ার পরে ওদের দিতে হতো।

সবচেয়ে ভালো পোশাক বলতে হাঁটু-ছেঁড়া প্যাণ্ট আর তালিমারা আধ-ছেঁড়া জুতো জোড়া চকচকে পালিশ করে ফিটফাট বাবুটি সেজে, কিশোর চার্লিও ব্ল্যাকমুরের অফিসে গেলো। ঘর বোঝাই সুন্দর যুবক-যুবতী। দামী দামী পোশাকে-আসাকে সবাইকে বেশ কেউকেটা দেখাচ্ছিলো। এক একজনেরতো রাজপুত্রের মত চেহারা। পরিশীলিত উচ্চারণে অনেকেই নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো। চার্লি বোকার মত চেয়ে চেয়ে দেখছিলো সবাইকে। জড়সড় ভাবে সে দাঁড়িয়েছিলো ঘরের এক কোণে। কাউকে কিছু বলা বা জিগ্যেস করার সাহসটুকুও নেই তার। এমন সময় একজন কেরানী—যার পোশাক ছিমছাম, কেতাদুরস্ত চালচলন—বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। পেশাদারী নিস্পৃহতায় ঘরে সবার দিকে তাকিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বলে চললো, 'আপনি···হ্যাঁ···পরে···আসবেন···এখনও কিছু হয়নি···পরে খোঁজ নেবেন···আপনি···আপনিও···'

দ্রুত ঘর ফাঁকা হয়ে গেলো। চার্লি তো রকম সকম দেখে থ-মেরে গেছে তখন। কেরানীর চোখ গেলো চার্লির দিকে। 'কি ব্যাপার ভাই তোমার?'

'না···মানে আমি অ—অভিনয়—মানে আপনাদের কাছে ছোটদের মানে আমাকে পার্ট দেবার মত কিছু হবে?'

করুন ভয় পাওয়া গলা চার্লির।

'ওহ্। তা—খাতায় নাম তোলা হয়েছে কি?'

'না—মানে—না তো।'

'আমার সঙ্গে এসো। নাম তুলবে।'—কেরানী চার্লিকে সঙ্গে করে ঢুকলো ভেতরের ঘরে।

বিরাট ঢাউস এক চিত্রগুপ্তর খাতাতে নামধাম ঠিকানা বয়স অভিজ্ঞতা চেহারার বর্ণনা আর বিশেষত্ব লেখা হলো চার্লির। কেরানীবাবু জানালো কিছু হলে পরে খবর পাঠানো হবে। দুরুদুরু বক্ষে চার্লি বাড়ি ফিরে এলো।

অনেকদিন কেটে গেলো—না কোন চিঠির পাত্তা নেই ব্ল্যাকমুরের অফিস থেকে। চার্লিতো ভুলেই যেতে বসেছিলো ব্যাপারটা। এর ভেতরে অনেক কিছু ঘটে গেছে। সিডনি ফিরে এসেছে; তাও তো প্রায় একমাস হয়ে গেলো। খবরটা নিয়ে এলো সিডনি। একটা পোস্টকার্ড। ব্ল্যাকমুরের অফিসে যত দ্রুত সম্ভব চার্লি যেন দেখা করে।

নতুন কেনা পোশাক পরে গটগট করে চার্লি হাজির হলো ব্ল্যাকমুরের অফিসে। অমায়িক হাসিতে আপ্যায়িত হলো সে। ব্ল্যাকমুর চার্লিকে খুঁটিয়ে দেখলেন। চিঠি লিখে দিলেন একটা। চার্লি যেন চার্লস ফ্রোম্যানের অফিসে যেয়ে মিঃ সি. ই. হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করে।

ঠিকানা খুঁজে চার্লি গেলো হ্যামিলটনের অফিসে। ব্ল্যাকমুরের চিঠি দিলো। সব পড়ে, চার্লিকে দেখে খুবই খুশী হলেন। চার্লির বয়স তখন আসলে সাড়ে বারো। নির্দ্বিধায় দেড়টা বছর বাড়িয়ে নিয়ে হ্যামিলটনকে জানালো ওর বয়স চোদ্দ। হ্যামিলটন জানালেন তাঁর কথা। শার্লক হোমস নামে নাটক নামছে। একটানা চল্লিশ সপ্তাহ অভিনয় চলবে ঘুরে ঘুরে ভ্রাম্যমান দলে। তাতে হোমসের খাস ভৃত্য—যার নাম বিলি—সে ভূমিকায় অভিনয় করছেন যিনি—সেই সেণ্টসবারি আরেকটা নতুন নাটক লিখেছেন—নাম জিম, তাতেও

ভারী চমৎকার একটা চরিত্র আছে যা চার্লিকে দারুন মানাবে। শার্লক হোমস নাটকের পরে অভিনীত হবে জিম। সেটা নিয়েও দল বাইরে বেরুবে। তবে গোড়ার দিকের অভিনয় খুব শীগগীরই হবে কিংস্টন রঙ্গমঞ্চে—ওখানে নাটকের বোদ্ধা—সমালোচক আর জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিরা আসবেন অভিনয়ের দিন। চার্লিকে ওঁদের সামনে অভিনয় করতে হবে। চার্লি যদি অভিনয়ে রাজী থাকে তবে প্রতি সপ্তাহে আড়াই পাউণ্ড মাইনে পাবে।

আড়াই পাউণ্ড মাইনে মিলবে শুনেতো চার্লির বুকে ভূমিকম্প শুরু হলো আনন্দে আর উত্তেজনায়। তবুও যথাসম্ভব গম্ভীর মুখে স্বাভাবিক গলায় চার্লি জানালো, 'এ ব্যাপারে এক্ষুনি কোন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মানে—কিছু কথা দিতে পারছিনা। আমাকে একটু ভাবতে হবে। আগে আমার দাদার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিতে হবে। পরে আপনাদের আমার মতামত জানাবো।'

চার্লির ভাব-ভাঙ্গি আর কথাবলার কায়দার জন্যই হোক বা যে ভাবেই হোক শুনেতো হ্যামিল্টনের হো-হো ঘর ফাটানো হাসি। অফিসের সবাইকে, ডেকে চার্লির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'এ হলো আমাদের বিলি। কি দারুণ মানাবে না! সবাই এক বাক্যে সায় দিলেন হ্যামিল্টনের কথাতে। সবার মিষ্টি মধুর ব্যবহারে চার্লির মনে হলো তার পৃথিবী কত দ্রুত বদলে যেতে চলেছে। হ্যামিল্টন খসখস করে লিখে ফেললেন চিঠি। চার্লিকে বললেন যেন সে অবিলম্বে চিঠি নিয়ে লাইসেস্টার স্কোয়ারে গ্রীণরুম ক্লাবে গিয়ে সেন্টসবারির সঙ্গে দেখা করে।

চার্লির কপাল ভালো। ওকে খুবই পছন্দ হলো সেন্টসবারির। জিম নাটকে স্যামি চরিত্রের ভূমিকায় মনোনীত হলো চার্লি। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওকে। পার্ট লেখাই ছিলো। চার্লিকে দেওয়া হলো পার্ট ধরিয়ে। চরিত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চার্লিতো আবার ভয়ে ভয়ে আছে। যদি ওকে পার্টটা পড়তে বলেন সেণ্টসবারি, তাহলেই সর্বনাশ। চার্লিতো ভালো করে রিডিং পড়তেই পারেনা তখন। পড়তে গেলে হোঁচট খায় প্রতি লাইনে। কিন্তু চার্লির কপাল ভালো যে সেণ্টসবারি ওকে রেহাই দিলেন—পড়তে বল্লেননা সবার সামনে। বাড়ি গিয়ে ভালো করে সড়গর করতে বল্লেন পার্টটাকে। ঠিক এক সপ্তাহ পরেই মহলা শুরু হবে। তার আগেই খুব ভালো করে যেন মুখস্থ করে ফেলে পার্টটা।

চার্লি বাড়ি ফিরলো যেন মেঘের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে। এক নতুন জগতে প্রবেশ করতে চলেছে সে। অভিনয় জগত। চার্লির জীবনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। সে হবে নট। মায়ের কাছে চার্লি শুনেছে অভিনেতাদের জীবনের কতনা গল্প—তখন থেকেই একটু একটু করে ভালোবেসে ফেলেছে সে অভিনয়কে; অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ এসে চার্লির দরজাতে কড়া নাড়ছে আজ। নতুন বাদামী কাগজে মোড়া সাদা কাগজের পার্টের পাতাকটাকে বুকের মধ্যে সংগোপনে ধরে রাখে চার্লি। গভীর মমতায় হাত বুলোয়। তৃপ্তিতে উজ্জ্বল চোখমুখ। আনন্দে চার্লির চোখে জল আসে! অনেক—অনেক বড় অভিনেতা হতে হবে তাকে। সুনাম—প্রশংসা—আর ভালোবাসায় ভরে যাবে সে।

সিডনিকে বাড়ি ফিরেই যেন সে ঘোরের মধ্যে খুলে বলে সব। স্বপ্নের ঘোরে চার্লির সব কথা শুনলো সিডনি ও। আনন্দে আর আবেগে চোখে জল এলো। তার চেয়ে সুখী আজ আর কেউ নেই। বুক ঠেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ে। মনে পড়ে ওর মায়ের কথা। মা কাছে থাকলে কতই না খুশী হতেন। ওদের অভাবের দিন শেষ হতে চলেছে!

চার্লি আর সিডনি মিলে হিসেব করে চলে। চল্লিশ সপ্তাহে হয় একশো পাউণ্ড। সব সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে, হাতে বেশী কিছু থাকবে বলে মনে হলোনা ওদের। অনেক আলোচনার পর ঠিক

করলো—মাইনেটা আড়াই পাউণ্ড হিসাবে বড্ড কম। পার্টটা খুবই বড়। খাটুনি পড়বে খুব। সিডনি চার্লির সংগে যেয়ে হ্যামিল্টনকে চাপ দেবে মাইনেটা বাড়ানোর জন্য।

যা ভাবা তাই কাজ। পরদিন সিডনি গেলো। কথাটা তুললো। কিন্তু হ্যামিল্টন কিছুতেই এর বেশী বাড়াতে রাজী হলেন না।

বেশ বড়ো চরিত্র। মোট পঁয়ত্রিশ বার সংলাপ বলা আছে। চার্লিতো পড়তে পারেনা। সিডনি জোরে জোরে স্পষ্ট কাটা কাটা ভাবে পড়ে শোনায়। শুনে শুনে একেকটা লাইন মুখস্থ করে চার্লি। তিন দিনের মধ্যে সে জলের মত মুখস্থ করে ফেললো পার্টটা। মহলার সময় চার্লির অভিনয় দেখেতো সবাই অবাক। সেণ্টসবারিতো দারুণ খুশী হলেন। চার্লিকে জিজ্ঞেস করলেন আগে কোথায়ও অভিনয় করেছে কিনা। চার্লি কোনো জবাব দেয়না। লাজুক হাসে। সবাই এক বাক্যে সায় দিলো যে অভিনয়ের বীজ চার্লির রক্তের মধ্যেই রয়েছে, খুবই সহজাত ব্যাপার।

জিম নাটকের মূল গল্প নেওয়া হয়েছে হেনরি আর্থার মিলারের 'সিলভার কিং' উপন্যাস থেকে। দু'সপ্তাহের জন্য 'জিম' নাটকের অভিনয় চলবে। এক সপ্তাহ কিংসটন থিয়েটারে। বাকী সাতদিন হবে ফুলহ্যাম রঙ্গমঞ্চে।

চার্লি এ নাটকে দর্শককে একেবারে মাতিয়ে রাখতো। চার্লির প্রতিটি সংলাপে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো দর্শকের। একটা ব্যাপারে চার্লি খুবই অসুবিধায় পড়তো। মঞ্চে সত্যি সত্যি চা বানাতে হতো ওকে। স্টোভ ধরানোর পর আগে চাপাতা বসিয়ে দেবে, নাকি আগে জল বসাবে—এটা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলতো ও।

কিন্তু জিম নাটক আদৌ চললো না। নাট্য-সমালোচকেরা নির্মম সমালোচনাতে সবাইকে আক্রমন করলেন। বেঁচে গেলো শুধু চার্লি। চার্লির অভিনয়ে সবাই মুগ্ধ। নাটকে স্যামির চরিত্রে বালক চার্লি

অসামান্য অভিনয় করেছে। লণ্ডনের পথে পথে সে খবরের কাগজ ফিরি করে বেড়ায়। কৌতুক অভিনয়ে চার্লি যে একদিন বড় অভিনেতা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দলের অন্যান্য দিকপাল অভিনেতা—যেমন চার্লস রক তিনিও পার পেলেন না। 'লণ্ডন টপিক্যাল টাইমস্'পত্রিকাতে বেরুনো জিম নাটকের সমালোচনার পাতাটা তিনিই চার্লিকে দেখালেন। উপদেশ দিলেন, সমালোচনাতে প্রশংসা পেয়েছে বলে যাতে চার্লি গর্বিত না হয়। নিজেকে কেউকেটা না ভাবে। তাহলেই পতন অনিবার্য্য। কাগজে বালক চার্লি চ্যাপলিনের আগামী দিনের সাফল্য কামনা করা হয়েছে।

সিডনিতো সমালোচনা পড়ে আনন্দে আত্মহারা। এক ডজন কাগজই কিনে ফেললো লোককে পড়াবে বলে।

এদিকে শার্লক হোমস নাটকের মহলা শুরু হলো। ওরা তখনও দু'ভাইমিলে সেই পাওন্যাল টেরাসের ভাড়া বাসাতেই থাকে। বাসা পাল্টাতে সাহস করেনা—যদি হঠাৎ আবার অবস্থা পড়ে যায়।

দুভাই মিলে কেনহিল পাগলাগারদে মাকে দেখতে যায়। চার্লি ছোট বলে মায়ের কাছে চার্লিকে সহজে যেতে দিতে চায়না নার্সরা।

সিডনি একাই ভেতরে গিয়ে মাকে দেখে আসে। মা একদম সেরে ওঠেন নি। অনেক ধরাধরির পর চার্লিরও অনুমতি মেলে মাকে দেখতে পাবার। কিন্তু না গেলেই যেন ভালো হতো চার্লির পক্ষে। শেকল দিয়ে মায়ের হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। চার্লিকে ইংগিতে কাছে ডাকেন। কানে কানে ফিসফিস করে বলেন, "সাবধান। চোখ-কানখোলা রাখবি। পথ ভুলে যাসনা যেন—তাহলে ওরা কিন্তু তোকেও আটকে রাখবে আমার মত।" মা মোট আঠারো মাস কেনহিল হাসপাতালে ছিলেন। সিডনি নিয়মিত মাকে দেখতে যেতো। চার্লিকে চিঠি লিখে জানাতো মায়ের খবর। চার্লিতো তখন দলের সঙ্গে বাইরে ঘুরে ঘুরে নাটক করতে ব্যস্ত।

এরিভাবে ছ মাস কেটে গেলো জেলায় জেলায় নাটক করে।

সিডনির চিঠি আসে ! এখানো ওর ভাগ্যে থিয়েটারে অভিনয় করার কোন সুযোগ আসেনি। মন ভেঙ্গে পড়ে ওর। শেষমেষ অভিনয় করার আশা ছেড়েছুড়ে মদের দোকানে চাকরি নিলো। মদ যোগানদারের পদ। দেড়শো জন প্রার্থীর মধ্যে একমাত্র সিডনিকেই মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়েছিল। সিডনি নিয়মিত চিঠি লেখে চার্লিকে। চার্লির উত্তর দেওয়া হয়না। চার্লির আবার চিঠিপত্র লিখতে ভালো লাগেনা। তাছাড়া বানানটানান ভুল হয় বলে আরও লিখতে চাইতোনা। এতে করে উত্তর না পেয়ে খুবই দুঃখ পেলো সিডনি। লিখলো, 'মায়ের অসুখ হওয়ার পর আমাদের পৃথিবী একেবারে ছোট হয়ে গেছে। এখন আর আমরা তিনজন নই, আমরা দু'জন। তুমি আর আমি। মনে পড়ে পুরনো সেই ভয়ংকর দিনগুলোর কথা। যখন আমরা খেতে পেতাম না—মিলে মিশে দুঃখের ভাগ নিতাম। আমি যে তোমার ভাই এটা যে তোমার মনে আছে—অন্ততঃ সেজন্যই আমাকে তোমার চিঠি লেখা দরকার···'

চার্লির ভেতরটা নড়ে উঠলো। সিডনিকে যেন নতুন করে চিনতে পারলো। সিডনির নি-খাদ ভালবাসাতে অভিভূত হয়ে গেলো সে। কিন্তু এসবের মাঝখানে ও একটু একটু করে নিঃসঙ্গতা যেন গ্রাস করে নিলো চার্লিকে। কথা বলতে পারেনা প্রাণ খুলে। ও ছোট বলে দলের সবাই ওর সামনে বেশী কথা বলেন না, সবরকম আলোচনা করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। চার্লি একা একা রাস্তায় পায়চারি করে। অন্ধকার পথে গীর্জার ঘণ্টা বাজে ঢং-ঢং শব্দে। এক নির্মম ঔদাসীন্য ওকে পেয়ে বসে।

হয়তো বা বাজারে গেলো। লোকের ভিড়। চতুর্দিকের হৈ-চৈ এর মাঝখানে দাঁড়িয়েও চার্লি নির্জনতায় ভুগতো। চার্লিকে যে বাড়িতে দল-কর্তৃপক্ষ থাকতে দিয়েছেন, সে বাড়ির মহিলার জন্য কিনে ফেলে মাছ-তরকারি মশলাপাতি। ভদ্রমহিলা রান্না করেন। বাড়ির সবাই মিলে এক সংগে বসে আনন্দ করে খাওয়া দাওয়া হয়। ভদ্র-

মহিলার হাতে তৈরি গরমা-গরম পাউরুটি খেতে ভারী ভালো লাগল চার্লির। চিনি-মাখন ছাড়াই শুধু খেয়ে ফেলতো সবটা।

কিন্তু তবুও কোনকিছু ভালো না লাগার এক অসুখ যেন চার্লিকে পেয়ে বসে। কাজে কর্মে কেমন যেন একটা ঢিলেমি এলো ওর। জামাকাপড়ের যত্ন নেই। চান-খাওয়ার ব্যাপারেও আলস্য লাগে। দল হয়তো অভিনয়ের পাট চুকিয়ে নতুন কোথায়ও চলেছে, গাড়ি ছাড়ার মুখে হন্তদন্ত হয়ে হতশ্রী আলুথালু পোশাকে, চার্লি এসে হাজির শেষ মুহূর্তে। একা একা সময় কাটতে চায়না বলে চার্লি একটা খরগোশ পুষতে শুরু করলো। দল যখন যেখানে যায়—চার্লির সংগে খরগোশটা থাকে। তবে মুস্কিল বাধে সাধারণত নিত্য নতুন বাড়িউলিদের নিয়ে। এদের অনেকেই আবার খরগোশ দেখতে পারে না। কারণ—খরগোশ দেখতে যতই ফুটফুটে ফরসা হোক, গা মখমলের মত তুলতুলে মসৃণ হোক, তবুও গা থেকে যে বোঁটকা গন্ধ ছাড়ে সেটা অনেকেরেই পছন্দ নয়। এম্নিতে খরগোশ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। খরগোশটাকে চার্লি শিখিয়েও নিলো। যেইনা দরজায় লোক আসার ঠক ঠক শব্দ হতো ওমনি ও গিয়ে ঢুকতো খাটের নীচের কাঠের খাঁচায়। ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে খরগোশটা সারা ঘরে খেলে বেড়ায়। বাড়িউলির কাছে কোথাও ধরা পড়ে গেলে শিক্ষিত খরগোশের বুদ্ধির কেরামতি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতো চার্লি। যত অনিচ্ছাই থাকুক না কেন তবুও মুখ ফুটে খরগোশটাকে ঘরের বাইরে রাখার কথা কেউ বলতে পারতোনা।

দল তখন ওয়েলসে। টনিপ্যাণ্ডিতে। সেখানে বাড়িউলির কাছে খরগোশশুদ্ধ হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলো চার্লি। যথারীতি চার্লি খরগোশের খাঁচায় ঢোকার খেলা দেখিয়ে দিলো। বাড়িউলি দেখলেন। মুচকি হাসলেন। সেদিনই রাতে অভিনয় শেষে বাড়ি ফিরে খরগোশটাকে অনেকবার ডেকেও কোন সাড়া পেলোনা চার্লি। তন্নতন্ন করে চতুর্দিকে খোঁজা হল। বাড়িউলি ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস

করাতে তিনি নিস্পৃহ মুখে বল্লেন, "কি জানি কোথায় গেছে। কেউ হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে। আমিতো ঠিক জানিনা। হয়তো জানালা দিয়ে বাইরের জঙ্গলে চলে গেছে।" চার্লি বুঝলো এ সবই হলো বাড়িউলির হাতের খেল—নিজেই খরগোশের সদ্গতি করেছেন।

টনিপ্যাণ্ডি থেকে দল গেলো এবো ভেলে। নোংরা ধুলো ধোঁয়াময় একখানি শহর। চারিদিকে শুধু কয়লা খনি। একই রকম দেখতে প্রাণহীন শ্রমিক বসতি। কেরোসিনের কুপি জ্বলে ঘরে ঘরে। দলের আর সবাই গিয়ে হোটেলে উঠলো। চার্লির থাকার জায়গা ঠিক হলো এক মজুরের বাড়িতে। ওদের চারখানা ঘর। বাইরের ঘরটা চার্লিকে ছেড়ে দিলো। চারপাশের তুলনায় বেশ পরিষ্কার পরিছন্ন। বাড়ির কর্তা খনিমজুর। শক্তসামর্থ চেহারা। গিন্নী মধ্যবয়স্কা—দারুণ স্বাস্থ্যের দীর্ঘাঙ্গীনি মহিলা এমনিতে সুন্দরী—তবে চোখেমুখে বিষন্নতা। কর্তা গিন্নীর-বয়স প্রায় সমান সমান।

রাতে অভিনয় শেষে ফিরেই চার্লি দেখতো, উনুনের পাশে খাবার ঢাকা দেওয়া, বেশ গরম থাকতো। দিনের বেলাও চার্লির সংগে কোন কথা বলতেন না গিন্নী। সকালের খাবারও চুপচাপ রেখে চলে যেতেন। আর একটা ব্যাপার নজরে পড়লো চার্লির—রান্নাঘরটা সবসময় বন্ধ করা থাকে।

ওখানে থাকার দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। চার্লি তার নিজের ঘরে বসে রাতের খাবার খাচ্ছে। কর্তা ঘরে ঢুকলেন রাতে শোবার পোশাকে। হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। ইতস্ততঃ গলায় বলে উঠলেন, একটা অদ্ভুত জিনিস তোমাকে দেখাতে পারি। তোমরাতো থিয়েটারের লোক। কত রকম জিনিসের দরকার হয় তোমাদের। কখনও ব্যাঙ-মানুষ দেখেছো। অবিকল ব্যাঙের মতো মানুষ। দাঁড়াও দেখাছি।'

চার্লিকে নিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে। জামাকাপড়ের আলনা—

তাতে পর্দা খাটানো। পর্দার নীচে দরজা লাগানো ছোট্ট একটা বাক্সের মত। বাক্সের দরজা খুলে ডাকলেন, 'গিলবার্ট—একবার বেরিয়ে আয়তো। দেখ কে এসেছে—।'

বেরিয়ে এলো গিলবার্ট। দেখেতো চার্লি স্তম্ভিত। হতভম্ব। এক অদ্ভুত জীব পা নেই, বিসদৃশ শরীর। চৌকো মাথা। কটা চুল। ছোট রোগাটে মুখ। নাক নেই বল্লেই চলে। মস্ত বড়ো হাঁ মুখ। মজবুত পেশীবহুল গাট্টাগোট্টা হাত। উরু পর্য্যন্ত একটা প্যান্ট পরণে। চোখে পড়ে দু'পায়ে দশটা সরু সরু আঙ্গুল। ওই হলো গিয়ে পা। বয়েস বিশ ও হতে পারে আবার চল্লিশ ও হতে পারে। কোদালের মত বড় বড় হলদে দাঁত বের করে সে চার্লিকে দেখে হাসলো। গিলবার্টকে তার বাবা লাফ দিয়ে দেখাতে বললেন। মাথা নীচু করে দু'হাতে ভর দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে বেশ কয়েকটা লাফ মারলো সে। চার্লিকে গিলবার্টের বাবা বল্লেন, "তোমার কি মনে হয় বলতো ? সার্কাসে এরকম মানুষ-ব্যাঙ নেবেনা ?"

চার্লি আর কি করে। ভেবেচিন্তে একগাদা সার্কাস কোম্পানির নাম আউড়ে গেলো। বললো ওদের চিঠি লিখে দেখতে। সব শুনেতো গিলবার্ট কখনো লাফ মেরে, ডিগবাজি খেয়ে, চেয়ারের হাতলে দাঁড়িয়ে, ব্যাঙের মত সারাঘর হেঁটে নানারকম খেলা দেখিয়ে চললো চার্লিকে। খেলা দেখিয়ে বেচারা ঘেমে নেয়ে অস্থির। চার্লি শেষে অনেক প্রশংসা আর উৎসাহ দেখিয়ে থামালো ওকে। গিলবার্টকে খেলা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলো চার্লি। শুতে গেলো। কিন্তু সে রাতে কেন যেন ঘুম এলোনা ওর।

পরদিন সকালে অনেকটা হাসি খুশী চেহারা নিয়ে গিন্নী এলেন খাবার নিয়ে। চার্লি গিলবার্টকে দেখেছে জেনে অন্যরকম দেখাচ্ছে। কথায় কথায় জানালেন, থিয়েটারের বা বাইরের লোকজন এলে তাদের সামনে গিলবার্ট একদম বেরোতে চায় না। ও তখন আলনার নীচে থাকে। চার্লি বেশ বুঝতে পারলো যে তাকে গিলিবার্টের বিছানাতে

শুতে দেওয়া হয়েছে। সারা শরীর শিউরে উঠলো ওর বিশ্রী এক ক্লেদাক্ত অনুভূতিতে। ভাগ্য ভালো সে রাত্রেই দল ওখান থেকে অন্যত্র রওনা হলো। চার্লিকে আর থাকতে হলোনা সেখানে। যদিও বিদায় নেবার জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়েও চার্লিকে গিলবার্টের সঙ্গে করমর্দন করতে হলো।

চল্লিশ সপ্তাহ ধরে টানা অভিনয় চলার পরও, আরও আট সপ্তাহের বাড়তি চুক্তি হলো। লণ্ডনের কাছাকাছি অভিনয় চলবে। শার্লক হোমস নাটক নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে গেছে চতুর্দিকে। চূড়ান্ত খ্যাতি পেলো শার্লক হোমস নাটক। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে অভিনয়ের ডাক আসছে। মাঝে তিন সপ্তাহ ছুটি। তারপরই আবার সদলবলে অভিনয়-ভ্রমণসূচী চলতে থাকবে।

চার্লিরা বাসা বদলেছে। উঠে গেছে কেনিংটন রোডের নতুন বাসাতে। ভাড়া অবশ্য অনেক বেশী আগের চেয়ে, তবে এখন বেশী ভাড়া দিতে অসুবিধে নেই ওদের।

বেশ বড় আর খোলামেলা পাশাপাশি দুখানা শোবার ঘর। সংগে রয়েছে বাইরের লোকজন এলে বসার ঘর। সিডনি আর চার্লি ঘর সাজিয়ে ফেললো। ভাড়া করে আনলো মস্ত বড় এক পিয়ানো। রাখলো মায়ের থাকবার ঘরে। বিছানার পাশে দামী এক কাঠের কারুকাজ করা টেবিল। সুদৃশ্য ফুলদানীতে রং বেরংয়ের বাহারী ফুলের গুচ্ছ। এক পাশে ডিম্বাকৃতি খাবার টেবিল। চারটে চেয়ার সাজানো। ওরা সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো মায়ের ফিরে আসার দিনটির দিকে চেয়ে। মানসিক হাসপাতালের ডাক্তারেরা চার্লির মাকে সারিয়ে তুলেছেন। চিঠি দিয়ে জানালেন সিডনিকে। দুভাই ট্রেনের টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিলো মাকে। আসার দিন আনন্দে আর উত্তেজনাতে দুভাই অনেক আগেই স্টেশনে গিয়ে হাজির। মায়ের কি পছন্দ হবে ওদের সাজানো ঘরদোর। মা আবার আগের মতো ওদের ভালবাসবেতো—অমনি কত কথাই

না মনে হলো ওদের। চার্লি আর সিডনির কথা যেন আর শেষ হয় না মাকে ঘিরে।

অবশেষে ট্রেন এলো। নামছে একের পর এক যাত্রী। ব্যাগ্র ব্যাকুল চোখে চার্লি আর সিডনি সবার মুখের ওপর চেয়ে চেয়ে দেখে। মা ওদের আগেই দেখতে পেয়েছেন। হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। কিন্তু কাঁদলেননা। আদর করলেননা, —চুমু খেলেন না পর্যন্ত চার্লি আর সিডনিকে। নিরাশ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো দুভাই। মনপ্রাণ দিয়ে কথা বলে চললো মাকে খুশি করতে। কিন্তু মা যেন কেমন আনমনা। উদাসী চোখে সারাটা পথ তাকিয়ে রইলেন পথের দিকে।

বাসায় ফিরে দুভাই মাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো ওদের নিজ হাতে সাজানো ঘরদোর। বাইরে তখন উজ্জ্বল গাঢ় রোদের আলপনা। শান্ত-নিরিবিলির এক প্রশান্তি ঘিরে রয়েছে চতুর্দিকে। চার্লি আর সিডনি গভীর আগ্রহে মার কাছে জানতে চাইলে নতুন বাসা বাড়ি মার কেমন লাগছে। মা কিন্তু নিরুত্তর। এক নিশ্চল পাথর প্রতিমার মত তিনি বসে রইলেন। হঠাৎ-ই সব কথা যেন ফুরিয়ে গেল। ঘরের ভেতর নেমে এলো এক অটুট নীরবতা। এখন তো আর দারিদ্র্যের কালো দিনগুলো নেই। মা তবে কেন মন খারাপ করে বসে আছেন। মার কি তবে মনে পড়ছে পুরনো দারিদ্র্যের গন্ধমাখা সেই কুৎসিত দিনগুলোর কথা। এই তিন কামরার সাজানো গোছানো বাসাতে চার্লি আর সিডনি মনপ্রাণ ঢেলে আয়োজন করছে এক উৎসব মুখর দিনের। সবাইকে—চেনা জানা অভিনেতা অভিনেত্রীদের অনেক করে বলেছে ওদের মায়ের কথা, যিনি ছিলেন এককালের খুবই বড় মাপের অভিনেত্রী। সবাইকে চায়ের নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে। একটু পরেই সবাই আসতে শুরু করবেন। চার্লির মায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। চার্লি আর থাকতে পারল না। উঠে গেল মার কাছে। মায়ের বিষণ্ণ কপাল

থেকে সরিয়ে দিল উড়ে আসা ঝুড়ো চুল। মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল "মা, এবারে ওঠো। চান সেরে নাও। পোষাকটা পাল্টে নাও। খেতে হবে যে, একটু পরেই সবাই যে আসতে শুরুকরবে তোমাকে দেখতে।"

মায়ের চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে একটু। কি যেন হারিয়ে গেছে। কমনাযতা আর লালিত্যের জায়গা নিয়েছে ঈষৎ পৃথুলাভাব। মা কোনও রকমে দায়সারা ভাবে মুখে বুলিয়ে নিলেন পাউডারের সাফ্। আর কিছুই করলেন না। ম্লান বিষণ্ন গলায় হেসে বললেন,—"দূর, আসার আবার সাজগোজ। ওদের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছি তোদের কাছে, এটাই তো ঢের।"

দিন কাটে। আস্তে আস্তে মা হয়ে ওঠেন সহজ স্বাভাবিক। আগের মতই কিনে আনেন ফুল ফল, নিজের পছন্দ করা খাবার দাবার ছেলেদের জন্য। ফুল যে বড় ভালবাসেন তিনি। যখন দুঃসময় বাঘের মত ওত্ পেতে থাকত—তখনও এক পেনী দামের ফুলের তোড়া নিয়ে আসতে ভুলতেন না মা। মায়ের পরিবর্তনে দুভাই খুব খুশী। মা আনন্দে থাকুন ভাল থাকুন, এই তো ওদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তবুও মাকে মনে হয় এক নির্জন নিরালা দ্বীপের করুণাঘন বাসিন্দা। চার্লির বুকের মধ্যে তখন মেঘ ডাকার শব্দ হয়। বড় ভয় হয়। মা কি আবার পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই মা হাঁসফাঁস করেন নতুন বাসাতে। ফিরে যেতে চান পুরনো সেই পরিবেশে পুরনো বাসাতে। অগত্যা চেস্টার স্ট্রীটের সেই দোতলার বাসাটাই আবার ভাড়া নেওয়া হলো। দশ পাউণ্ড দিয়ে আসবাবপত্র কেনা হলো। মায়ের নিপুণ হাতের যাদুতে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুললেন ঘর দোর। চার্লি আর সিডনি দুজনে মিলে তখন রোজগার করে চার পাউণ্ড পাঁচ শিলিং। তা থেকে দুভাই মিলে মাকে প্রতি সপ্তাহে পাঠাত দেড় পাউণ্ড।

যখন অভিনয়ের চুক্তি থাকত না তখন দুভাই কাটাত মায়ের সঙ্গে। কিন্তু আর যেন ঘরে মায়ের পাশে থেকেও দুভাইয়ের দিন

কাটতে চাইত না। মন টিকত না। আসলে কাজ ছাড়া বসে থাকাটা ওদের আর ভাল লাগত না। ঘুরে ঘুরে অভিনয় করার মত তৃপ্তি যেন আর কিছুতেই মিলত না; দুভাই ঘরে বসে ছটফট করত কখন আবার অভিনয়ের ডাক আসে। ফাঁকি দিতে পারল না মায়ের চোখকে। ধরা পড়ে গেল। মা কিন্তু সেজন্য কোনও দুঃখ পেলেন না। একদিন আবার অভিনয়ের ডাক এলো। ঘর ছেড়ে পথে নামল চার্লি আর সিডনি। স্টেশনে বিদায় জানাতে এলেন মা, হাসতে হাসতেই রুমাল নাড়লেন।

দুভাইকে নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন মা। মা জানালেন লুইজি মারা গেছে। শেষ সময়টা নাকি খুব কষ্টে কেটেছে। ল্যামবেথের সেই আশ্রমে। ছেলেবেলায় চার্লিরা হ্যানওয়েলের যে স্কুলে ছিল সেই স্কুলেই আছে লুইজির ছেলেটা। চার্লির মা প্রতি সপ্তাহে অনাথ সেই বালককে নিয়ম করে দেখতে যেতেন। সঙ্গে নিয়ে যেতেন আপেল, কমলালেবু আর মিষ্টি। ছেলেটার তখন দশ বছর বয়স। চার্লি আর সিডনির কথা ওর কিছুই মনে নেই। ও তখন ছিল চার বছরের শিশু।

এদিকে মা আবার অসুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। চার্লিরা খবর পেল মা নাকি সারাদিন পথে পথে ঘুরতেন। রাতবিরেতে হুটহাট করে বেরিয়ে পড়তেন। আঁতিপাতি করে রাস্তাঘাটে কিযেন খুঁজে বেড়াতেন সব সময়। পাড়াপড়শীরা সে সব দেখে মাকে আবার উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়ে দেন। জীবনে আর কোনও দিন মা আর পুরোপুরি সেরে ওঠেন নি। ভাল হওয়াটা ছিল সাময়িক। চার্লি যখন লাখ লাখ টাকার মালিক তখন মাকে রেখেছিলেন নামী দামী নার্সিংহোমে। যত্নআত্তির অভাব ছিল না। দায়িত্ব পালনও যথাযথ করতো চার্লি। কিন্তু সবটাই হয়ে উঠত নিছক এক কর্তব্য মাত্র। মাকে ঘিরে যে সুখ, চরম স্বাচ্ছ্যন্দ্যের দিনে ওরা দুভাই তা কখনও আর ফিরে পায় নি।

দেশ দেশান্তরে নাটকের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় চার্লি সেজন্য তাই মাকে আর নিয়মিত দেখতে যাওয়ার সময় পায় না।

থিয়েটার রয়েলের মালিক হ্যারি ইয়র্কের দলে কাজ পেল চার্লি। মাইনে সপ্তাহে মাত্র পঁয়ত্রিশ শিলিঙ্। তাই-ই সই। চার্লির হাতে তখন নতুন কোনও কাজ নেই। অনামী দল, মাইনে কম। তার উপর স্টেজ ম্যানেজার আর নতুন পরিচালকের চার্লির উপর খুবই রাগ। চার্লির কাছে এই নাটকটি ছিল বহু অভিনীত সেই শার্লক হোম্‌স্ নাটক। বিলির ভূমিকায় অভিনয় করত সে। আগেই দল এ নাটকের সত্ত্ব বিক্রী করে দিয়েছিল হ্যারি ইয়র্কের কাছে। চার্লির তাই সবই জানা। পরিচালক চার্লিকে জিজ্ঞেস করতেন কোন জায়গাটা চার্লিরা কেমন করত। কি রকম হতো। চার্লি ভাল মনেই সব বলে দিত। এতে আবার ঝামেলা বাড়ত। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভাবত চার্লির খুব অহংকার। তাদের অপমান করার জন্যই চার্লি নতুন পরিচালকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। *এদিকে চার্লির কথাতে স্টেজ ম্যানেজারের হিসেব পত্রর কারচুপি* করতে হয়ে পড়ত অসুবিধে। তাতেই পোশাকের এক বোতাম হারানোর জন্য চার্লির কাছ থেকে কেটে নেওয়া হলো দশ শিলিঙ্।

উইলিয়াম জিলেট যিনি শার্লক হোম্‌স্ নাটক লিখেছিলেন তিনি তখন লণ্ডনে নতুন পালা "ক্লারিসা" নামিয়েছেন। এটাও তাঁরই লেখা। *সঙ্গে নিয়েছেন মেরি জেরোকে। কিন্তু কঠোর সমালোচনায়* নাটক বন্ধ হওয়ার উপক্রম। জিলেট নাকি অদ্ভুত বাচনভঙ্গীতে সারা নাটকে বক্তৃতা করে বেরিয়েছেন। জিলেটও দমবার পাত্র নন। লিখে ফেললেন নতুন পালা। নাম দিলেন শার্লক হোমসের শোচনীয় অবস্থা।" [Tee Painfull Predicament of Sherlock Holmes] নিজেই করবেন হোম্‌সের ভূমিকা। আগাগোড়া নাটকে একটি কথাও তাঁর নেই, সমস্ত সংলাপ মূলতঃ এক উন্মাদ মহিলা আর

হোম্‌সের বালক ভৃত্য বিলির মুখে। চার্লি যেহেতু বিলি করে নাম কিনেছিল সেহেতু খোঁজ পড়ল ওর। দল তখন বাইরে ঘুরছিল। সেখানেই চার্লি পেল টেলিগ্রাম। জিলেটের ম্যানেজার বাস্‌ট্যান্স টেলিগ্রামে লিখলেন, "বিলির ভূমিকায় চার্লি অভিনয় করুক উইলিয়াম জিলেটের এটাই আন্তরিক ইচ্ছে।" চার্লির মনে তখন দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলা। দল ছেড়ে হঠাৎ করে চলে গেলে এরাই বা 'বিলি' জোটাবে কোত্থেকে। আবার উইলিয়াম জিলেটের সঙ্গে অভিনয় করতে পারা সেটাও কম কথা নয়। যাহোক বিলি জোগাড় হলো। চার্লিও তল্‌পিতল্‌পা গুটিয়ে তক্ষুণি লণ্ডনে রওয়ানা দিলো। সন্ধ্যাতে পৌঁছে গেলো।

চার্লির কাছে সে সন্ধ্যাটি ছিলো জীবনের এক স্মরনীয় অভিজ্ঞতা। ডিউক অফ্‌ ইয়র্ক থিয়েটারের স্টেজ ম্যানেজার মিঃ পসট্যান্সের কাছে হাজির হতেই তিনি সোজা চার্লিকে নিয়ে গেলেন জিলেটের সাজঘরে। পরিচয় হওয়ার পর সোজাসুজি জিলেট চার্লিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি শার্লক হোম্‌স নাটকে আমার সঙ্গে অভিনয় করতে রাজী আছ?" চার্লি তখন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে দাড়িয়ে। কোনও রকমে মিনমিন করে বলে উঠল "এতো আমার দারুণ সৌভাগ্য—"

চার্লি তখন ষোলোতে পা রেখেছে। পরদিন সকালে রিহার্সাল ঘরে চার্লি প্রথম দেখল মেরি ডোরোকে। আগুনের মতই প্রখর সে রূপে চার্লির চোখ ধঁধিয়ে গেলো। প্রথম দেখাতেই সেই অনুপম শিল্প ষুষমামণ্ডিত সৌন্দর্যের কাছে স্তব্ধ নতজানু হয়ে পড়লো সেই বালক। প্রাচীন কালের কোন ইতালিয়ান অঙ্কনশিল্পীর আঁকা স্বর্গীয় পরী-ই যেন হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেয়ে পেয়েছে। 'ক্লারিসা' নাটকে ক্লারিসার ভূমিকায় অভিনয় করতো মেরী ডোরো। তবুও সমালোচনার ঝড় থামলোনা। 'শার্লক হোমসের শোচনীয় অবস্থা' নাটকে উন্মাদিনী এক মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতেন কুমারী আইরিণ ভ্যানব্রুগ। সারা বইতে বেশীরভাগ সংলাপই ছিলো তাঁর। অসাধারণ অভিনয়ও করতেন।

হোমসের ছোকরা চাকর সাজতো চার্লি। কিন্তু এত করেও শেষ-রক্ষা হলোনা। 'ক্লারিসা' নাটক চললোনা। বন্ধ হয়ে গেলো 'শার্লক হোমসের শোচনীয় অবস্থা', নাটকটিও। জিলেট অনেক ভেবেচিন্তে শেষে 'শার্লক হোমস' নাটকটিকেই পুনরাভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তখন একটি ঘটনা ঘটেছিলো। চার্লিতো জিলেটের সংগে অভিনয়ের আনন্দে মশগুল হয়েছিলো। অভিনয় সংক্রান্ত চুক্তিপত্র বা টাকাপয়সার ব্যাপারটা ঠিক করে নেয়নি। ফলে এক সপ্তাহ অভিনয় শেষে স্টেজ ম্যানেজার পসট্যান্স যখন বিনম্র লাজুক ভংগীতে মাত্র দু পাউণ্ড দশ শিলিং চার্লির হাতে গুঁজে দিলেন। তখন এত কম টাকা দেখে খুবই অবাক হলো চার্লি। ওরা নাকি আগের দলে খবর নিয়েছিলো। ওরা যা দিতো তাই ঠেকিয়ে দিলো মিষ্টি কথা বলে।

'হোমসের' মহলার সময় চার্লি আবার মেরী ডোরোকে দেখতে পেতো রোজ। দিন দিনই যেন বেশী সুন্দর দেখাতো ডোরোকে। এমনিতে অবশ্য নাটকে চার্লির সংগে মেরীর কোন দৃশ্য ছিলোনা। সৌন্দর্যের প্রতি চার্লির অপার তৃষ্ণার শুরু তখন থেকেই।

জিলেটের স্বপ্ন সার্থক হলো। চূড়ান্তভাবে সফল হলো 'শার্লক হোমস'। রানী আলেকজান্দ্রা এলেন নাটক দেখতে। সংগে এলেন গ্রীসের রাজা আর রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ান।

ডিউক অফ ইয়র্কস থিয়েটারে হোমস নাটক হচ্ছিলো। সেখানেই দিও বুসিকাল্টের সুদৃশ্য অফিস। আসা যাওয়ার পথে দেখা হলেই চার্লিকে খাতির করে মাথার চুল নাড়িয়ে দিয়ে আদর করে দিতেন। হল কেইন ও চার্লিকে খাতির করতেন। কেইন তো প্রায়ই ফাঁক পেলেই মঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে অভিনয় দেখতেন। একদিন লর্ড কিচেনার এলেন নাটক দেখতে। চার্লির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন যাবার সময়।

শার্লক হোমস নাটক যখন পুরোদমে চলছিলো তখনই মারা গেলেন স্যর হেনরী আর্ভিং। ওয়েস্টমিনিস্টার কবরখানাতে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিলো। অভিনেতা হিসাবে চার্লিও নিমন্ত্রিত হলো। চার্লির মনে খুব আনন্দ হলো—নিজেকে একজন কেউকেটা বলে মনে হলো। চার্লির আসন পড়লো নাম করা চিত্রতারকা লুইস ওয়েলারের পাশে। মেয়েরা তখন লুইস বলতে অজ্ঞান। 'মেটিনি আইডল' যাকে বলে। চার্লির আরেক পাশে বসেছেন পৃথিবী বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ ওয়ালফোর্ড বোডি। বিনা রক্তপাতে কাটাছেঁড়াতে এঁর জুড়ি ছিলোনা। পরবর্তীকালে এই ডাক্তারকে অনুকরণ করে চার্লি লিখেছিলো এক কৌতুক নক্সা। এদিকে সুপুরুষ লুইস তাঁর মনোরম ভঙ্গিতে চুপচাপ বসে আছেন। ঘাড় পর্য্যন্ত ঘোরাননা কোনদিকে। অন্যদিকে ডাক্তারতো সারাক্ষণ ছটফট করে মাথা নাড়েন আর উসখুস করতে থাকেন; তারউপর স্যর হেনরীর মৃতদেহ যখন কবরে নামানো হচ্ছিলো তখনতো ভালো করে দেখার জন্য উত্তেজনায় উঠেই দাঁড়ালেন। বিরক্ত হলেন লুইস। কিন্তু সামনের সারি থেকে প্রায় সবাই তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। কি আর করা। চার্লি বসে বসে সবার পিঠই দেখতে লাগলো।

শার্লক হোমস নাটকেয় শেষ রজনী অতিক্রান্ত হলো। মেরী ডোরো চলে গেলো আমেরিকাতে। দু-তিন বছর পর চার্লির সংগে মেরী ডোরোর আবার দেখা হয়েছিলো ফিলাডেলফিয়াতে। চার্লি তখন ফ্রেড কার্নোর দলে নিয়মিত অভিনয় করছিলো। সেদিনও মেরীর অবাক করা সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলো চার্লি।

হাতে কাজ নেই। বসে আছে চার্লি। বুসিকালট চার্লিকে চিঠি লিখে পাঠালেন কেণ্ডাল দম্পতির কাছে। নতুন নাটক নামানোর পরিকল্পনা ছিলো ওঁদের। যদি কোন কাজ জোটে নাটকে। সেন্ট জেমস থিয়েটারে তখন ওঁদের দল নিয়মিত অভিনয় করতো। শ্রীমতী

কেণ্ডালের সংগে দেখা করার সময় ঠিক হলো বেলা দশটাতে। চার্লিতো কাঁটায় কাঁটায় দশটাতে গিয়ে হাজির। কুড়ি মিনিট দেরী করে হন্তদন্ত হয়ে এলেন শ্রীমতী কেণ্ডাল। চার্লিকে দেখেই অসম্ভব ব্যস্ততায় খই ফুটলো তাঁর মুখে—'ওহ্ তোমার কথাই বলেছিলো বুসিকাল্ট—তুমিই সেই ছোকরা, বেশ শোনো নতুন নাটক নিয়ে খুব শীগগীরই বাইরে বেরিয়ে পড়ছি আমরা। ভেবেছিলাম আজই তোমাকে দিয়ে একবার পার্টটা বলাবো, কিন্তু আজ আমার ভীষণ কাজের তাড়া—ব্যস্ত আছি। তুমি বরং এক কাজ করো—কাল এসময়ে—এখানে আর একবার চলে আসবে—কেমন?'

কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালো চার্লি। 'আমি দুঃখিত ম্যাডাম—ওসব বাইরে ফাইরে যাওয়া আমার পোষাবেনা। আচ্ছা চলি—পরে দেখা হবে—'বলেই মাথায় টুপি পরে গটমটিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো চার্লি। রাস্তায় এসে হাত তুলে থামালো এক্কা গাড়ি। সোজা বাড়ির পথ ধরলো।

দেখতে দেখতে দশ মাস কেটে গেলো। চার্লি বেকার বসে। হাতে কোন কাজ এলোনা। সিডনির চুক্তিও শেষ হওয়াতে সেও তখন লণ্ডনে। তবে ফিরে এসেই সে নতুন কাজ জুটিয়ে ফেললো। থিয়েটারের কাগজ 'ইরা'তে বেরুনো এক বিজ্ঞপ্তি দেখে চার্লি ম্যানসনের দলে গিয়ে যোগ দিলো। কৌতুক চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। সে সময়ে এ ধরণের অনেক ভ্রাম্যমাণ নাটকের দল ছিলো। সবাই ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গাতে অভিনয় করে বেড়াতো।

চার্লি বল্ডউইনের দল করতো 'Bank Clerks'। জো বোগানির দল করতো—Lunatic Bakers. এরকম আরোও অনেক দল। নামেই নাটক। এসবই ছিলো আসলে মূকাভিনয়। জনপ্রিয় গানের তালে তালে ব্যালের ভঙ্গিতে—দেখতে ভালোই লাগতো লোকের। এদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ছিলো ফ্রেড কার্নোর দল। ফ্রেড কার্নোর ছিলো ত্রিশটার মতো দল। কার্নোর

ছিলো কৌতুক নক্সার প্রতি অতিরিক্ত দুর্বলতা। আর যত ঝোঁক ছিলো ওঁর পাখির ওপর। যত কৌতুক নক্সা সবগুলোই পাখি দিয়ে। যেমন—Jail Birds, Early Birds, Mumming Birds। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দল এই পালাগুলোই করতো। ভালো ভালো কৌতুক অভিনেতা ও ছিলেন ফ্রেড কার্নোর দলে। যেমন ফ্রেড কিচেন, জর্জ গ্রেভস্, হ্যারী ওয়েল্ডন, বিলি রীভস্, চার্লি বেল্—এমন আরও অনেক অভিনেতা।

ফ্রেড কার্নো সিডনির অভিনয় দেখে ওকে দলে নিলেন। মেননের দলে থাকাকালীন সিডনির অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন কার্নো। সপ্তাহে চার পাউণ্ড মাইনেতে ফ্রেড কার্নোর দলে অভিনয় করতে চুক্তি বদ্ধ হলো সিডনি। সিডনি তো আনন্দে আটখানা। ওর থেকে চার বছরের ছোট চার্লির তখন করুন অবস্থা। কোন থিয়েটারই ওকে ডাকেনা। জমানো টাকা ভেংগে ভেংগে খায় চার্লি আর মন খারাপ করে সারাদিন ঘুরে—ঘুরে বেড়ায়।

এগার

জীবনের এক চরম ও পরম মুহূর্তের সন্ধিলগ্নে এসে দাঁড়ায় চার্লি। পরিবর্তিত হতে থাকে শরীর আর মনের জলবায়ু। শৈশব পেরিয়ে কত দ্রুতই না চলে এলো কৈশোর। একদিন পেরিয়ে যেতে চাইলো সে অমল কিশোর দিনগুলো। যৌবন এলো তার অভিষেক উৎসবের বরণডালা সাজিয়ে। আবেগ আর অনুভূতি এখন খুবই প্রবল। ভাবতে ভালো লাগে—ভালো লাগে আকাশকুসুম কল্পনার জাল বুনতে। চার্লির ভেতরে এক অন্ধ ক্রোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পৃথিবীর সব কিছুকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে হয় অনেক অনেক টাকা রোজগার করবে— হবে অনেক—অনেক বড় অভিনেতা এক অদম্য রুদ্ধ আকাঙ্খা সব কিছুকে জয় করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। একাই থাকে চার্লি। মাঝেমাঝে ছোটখাটো কৌতুক নক্সা পালার কাজ পায়। ক্যাসির সার্কাস দলে 'ডিক্ টারপিন' পালাতে নায়কের ভূমিকা পেল। পুরো পালাটাকেই খোল নলচে বদলে হুবহু শল্য-চিকিৎসক-ডাক্তার উইলিয়াম বোর্ডির আদলে সম্পাদিত করে ফেলল চার্লি। তিন পাউণ্ড মাইনেতে চার্লি অভিনয় করে বেড়ায়। লাভ হয়েছিল একটাই। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে বয়স্ক সেজে যাচ্ছেতাই অভিনয় করত আর চার্লি সেখান থেকেই যোগাড় করে ফেলেছিল কৌতুকাভিনয়ের নিগূঢ় তত্ত্বের মালমসলা।

ক্যাসির দলে বেশী দিন অভিনয় করা পোষাল না। তিনমাস হয়ে গেল দল ছেড়েছে। এখনও কাজ জোটে নি। ঘরে বসে বসে অন্ন ধ্বংস। টাকা পাঠায় সিড্‌নি। ওতেই খরচ পত্র চলে। এক বাড়ীতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকে। গিন্নীর হাতে গুঁজে দেয় থাকা খাওয়া বাবদ্ চোদ্দ শিলিং। বাকি যা থাকে তা থেকে টেনেটুনে চলে হাত খরচ। সিড্‌নি এখন ফ্রেণ্ড কার্নোর দলের প্রথম সারির

অভিনেতাই শুধু নয়। রীতিমত কেষ্ট বিষ্টু হয়ে উঠেছে। সুবিধে পেলেই চার্লির অসাধারণ প্রতিভার কথা কার্নোর কানে তুলতে ভোলে না। ফ্রেড্ কার্নো গভীর জলের মাছ। সেজন্য শুনেও শোনে না। দেখেও কিছু দেখে না। কারণ আর কিছুই নয়। চার্লির বয়স যে খুবই কম। দেখায় আরও কম।

লণ্ডনের থিয়েটার গুলোতে তখন আসর জমিয়ে রেখেছিল কালো বা বাদামী চাপদাড়িওয়ালা ইহুদী অভিনেতাদের দল। চার্লিও ওদের দেখাদেখি দাড়ি রাখতে শুরু করল। দাড়িতে বয়সটা অনেকটা ঢাকা পড়ে। নিজেকে বেশ ভারিক্কী আর বুড়োটে দেখায়। ফাঁক পেলেই গান বাজনার আসরে ঢুকে পড়ে। চুটকি হাসির গানের দুটো চারটে বই পত্র কিনে ফেলে। যেমন কিনল অ্যামেরিকান কৌতুক নক্সা—"Madison's Budget"। বই থেকে মস্ক করে সে সব। একে তাকে ডেকে দেখায়। কেউ বিরক্ত হয়, কেউ হাসে। মাইল এণ্ড রোডে মাঝামাঝি ফোরস্টারস্ মিউজিক হল। সেখানে ক্যাসির দলের হয়ে অভিনয় করেছিল চার্লি। ওরা পছন্দ করল চার্লিকে। তবে এক সপ্তাহ চার্লির অভিনর পরীক্ষামূলকভাবে দেখবে। তারপর পাকাপোক্ত চুক্তি করবে। অভিনয়ের দিন মুখে রঙ্চঙ্ মেখে অনেক কষ্টে বয়স ঢেকে পুরনো আমলের বস্তাপচা দুর্বল রসিকতার নড়বড়ে নাটকে অভিনয় করতে উঠল। কিন্তু না। অবস্থা চরমে উঠল। দর্শক বিরক্ত হয়ে আপেল, পয়সা, কমলালেবুর খোসা, কলার খোসা ছুঁড়তে শুরু করল। শেয়াল কুকুর ডাকের আর কমাই নেই। চার্লিরও দফারফা হলো। ভুলে গেল পার্ট, জড়িয়ে গেল কথা, তোত্লাতে লাগল। নিরুপায় হয়ে মঞ্চ থেকেই কোনও রকমে কেটে পড়ল সোজা।

সেদিন রাতে অনেক ভেবেচিন্তে চার্লি সিদ্ধান্ত নিল কৌতুক অভিনয়ের যোগ্যতা তার নেই।

সতের বছর বয়সে পা দিতেই চার্লি মুখ্য ভূমিকাতে অভিনয়ের

সুযোগ পেল। নাম "The Merry Major"। কিন্তু শনির দশা রুখবেকে। চার্লির স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন পঞ্চাশোর্দ্ধ এক স্থূলাঙ্গী মহিলা। অভিনয় করার আগে মদ টেনে ঢুকল। নাটকের দৃশ্যে তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে চুমু খেতে গিয়ে মদের গন্ধে চার্লির তো প্রাণ যায় যায় অবস্থা। যাক বাঁচোয়া। দিন সাতেক চলার পর এম্নিতেই নাটক আর চলল না। নায়ক হওয়ার সাধ মিটে গেল চার্লির।

কিন্তু ঐ যে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। চার্লিকে পেয়ে বসল লেখক হওয়ার বাতিকে, রাত জেগে লিখে ফেলল কৌতুক নাটিকা "Twelve Just Men"। বিষয়বস্তু হলো, ঠিকমত কথা না রাখতে পারার অভিযোগে মামলার বিচার হচ্ছে। পাশে বসে আছে কয়েকজন জুরি। জুরিদের মধ্যে একজন মাতাল, একজন কালা, একজন হাতুড়ে ডাক্তার। বিখ্যাত সম্মোহন বিশারদ চার্কোয়েটের কাছে নক্সাটা বিক্রী করে দিল চার্লি। তিন পাউণ্ড পেল তাতে। চার্কোয়েট অবশ্য অনুরোধ জানাল সে যেন নাটকের নির্দেশনটা একটু দিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে নায়ক মঞ্চস্থ করার দায়িত্বও চাপিয়ে দিল চার্লির ঘাড়ে। অভিনেতা আর লোকজন জোগাড় করে গভীর উৎসাহে মহলা শুরু করে দিল চার্লি।

ইতিমধ্যে চার্লি আবার নিজের নাম গোপন করে নামকরা এক অভিনেতাকে নাটকটা পড়ালো। সে অভিনেতা তো পরিষ্কার বলেই ফেলল—"কোন মূর্খের লেখা এটা? যতসব ছাইভস্ম। কিচ্ছু হয় নি।" চার্লি অবশ্য তাতে দমল না। কিন্তু তিনদিন মহলা চলার পর চার্কোয়েট চিঠি দিয়ে জানালো নাটক বন্ধ করে দিতে। নাটক মঞ্চস্থ করতে তাঁর আর ইচ্ছে নেই। লজ্জার এক শেষ চার্লির। অতগুলো লোককে মুখের উপর কেমন করে না বলে দেবে। সবাই তিনদিন মহড়া দিয়েছে। এক পয়সাও কেউ পায় নি। সিড্নি তখন বাড়িতে ছিল। চার্লি তো সিডনিকে সব বলতে গিয়ে কেঁদেই

ফেলল। সিড্‌নি চার্কোয়েটের লেখা চিঠিটা দেখিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করল।

পরে অবশ্য সেই প্রধান ফোক্‌লা দাঁতের অভিনেতা সিডনির মুখে ঘটনা জেনে চার্লির পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসেই বাঁচে না। "আরে দূর দূর তুমি অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন? চার্কোয়েট মহা ধড়িবাজ শয়তান। নাটক না হওয়াতে তুমি বেঁচে গেলে। নাহলে বিপদে পড়তে।"

॥ বারো ॥

চতুর্দিকে যখন দুঃসংবাদের ছড়াছড়ি তখনই ভাগ্য দেবতা মুখ তুলে চাইলেন। সিডনি খবর নিয়ে এলো ফ্রেড কর্ণো নাকি চার্লিকে দেখা করতে বলেছেন। বিখ্যাত অভিনেতা—কৌতুক শিল্পী হ্যারি ওয়েলডনের সঙ্গে অভিনয় করতে হবে। নাটকটির নাম "The Football Match" খুবই জনপ্রিয় নাটক। ওয়েলডন তো সাক্ষাৎ বাঘ। চার্লির দেখা হলো ফ্রেড কার্ণোর সঙ্গে কোল্ড হারবার লেনে, ক্যাম্বার ওয়েলে থাকতেন ফ্রেড কার্নো। গাঁট্টাগোট্টা পেশীবহুল চেহারা ব্রোঞ্জের মত গায়ের রং। অদ্ভুত উজ্জ্বল দুই চোখ। জীবন শুরু করেছিলেন অভিনেতা হিসাবে। মূকাভিনয়ের সঙ্গে শরীরের কলা কৌশল দেখাতেন। পরে তিনজন কৌতুক অভিনেতাকে নিয়ে দল গড়েন। নানারকম কৌতুক নক্সা নিজেই লিখতেন। নিজে ভাল অভিনয়ও করতেন। এক কথায় হাস্যরসের পরীক্ষা নিরীক্ষা আর নানা রকম কাণ্ডকারখানা নিজেই করতেন। যখন নিজে পাঁচ ছ'টা দলের মালিক তখনও হাটে মাঠে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে নিজেও অভিনয় করতেন।

ফ্রেড কার্নোর বাড়ীর লাগোয়া গুদাম ঘরে তাঁর কুড়িটা দলের যাবতীয় নাটকের দৃশ্য, মঞ্চসজ্জা, পোষাক আসাক আর নানারকম উপকরণ থাকত। কর্নো তখন প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী। কার্ণোর অভিনয় জীবন থেকে অবসর গ্রহণের একটি মজার ঘটনা আছে। রাতে ম্যাঞ্চেস্টারে অভিনয় হচ্ছিল। কার্ণো তখন অভিনেতা। দলের অন্য অভিনেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে কার্ণোকে দিয়ে আর চলে না। সময় জ্ঞান ঠিক নেই। আর লোক হাসাতে পারেন না। অভিনয় বড্ড একঘেয়ে। কার্ণোর কানে কথাটা গেল। তিনি সেই অভিনেতাদের ডেকে বললেন, "বেশ যুবক বন্ধুরা! তোমরা যখন বলছ কার্ণোর অভিনয় চলে না, তখন আজ থেকে অভিনয় বন্ধ।

আর অভিনয় করছি না।" কথাটা বলেই একটানে খুলে ফেললেন মাথার পরচুল। সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিলেন তাঁর অভিনয় জীবনের ইস্তফার কথা। অথচ কার্ণো তখন পাঁচটি অভিনয় রজনীর জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পেতে অভ্যস্ত ছিলেন।

চার্লি ঢুকতেই কার্ণো তাকে সমাদর করে বসতে বললেন। "তোমার দাদা আমাকে সব বলেছে। তা তুমি হ্যারি ওয়েলডনের বিপরীতে ঐ চরিত্রটা করতে পারবে তো? ফুটবল ম্যাচ নাটকটা দেখেছো তো?" "হ্যাঁ দেখেছি সুযোগ পেলেই আমি ঠিক পারব।" "কিন্তু তোমাকে যে ভীষণ ছেলে মানুষ দেখতে। মাত্র সতেরো। দেখায় আরও কম।" তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকিয়ে যেন এক ফুৎকারেই চার্লি উড়িয়ে দিল কার্ণোর কথা—"ও আর এমন কি, ওটা কোনও ব্যাপার হলো? ঠিকঠাক রং মেখে গোঁফদাড়ি পরে মেক আপ মারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" চার্লির কথাতে কার্ণো হাসলেন। বললেন—"বাঃ বাঃ; তা বেশ! দেখি তোমার কত এলেম!"

পরীক্ষামূলক অভিনয়ের ভিত্তিতে দু সপ্তাহের চুক্তিতে চার্লি কাজ পেল। সপ্তাহে তিন পাউণ্ড দশ শিলিঙ মাইনে। কার্ণোকে খুশী করতে পারলে সারা বছরের পাকা চুক্তি পত্র মিলবে।

হ্যারি ওয়েলডন শুধু বড় অভিনেতাই ছিলেন না, সেরা মাইনেও পেতেন। সপ্তাহে চৌত্রিশ পাউণ্ড পেতেন তিনি। পরে সিডনির মুখে চার্লি জেনেছিল কার্ণোর সামনে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে কাঁধ বাঁকানোটাই কার্ণোকে মুগ্ধ করেছিল! কাজটা ঐ জন্যই জুটেছিল।

তখন শেফার্স বুশ এমবায়োরে "ফুটবল" নাটকটি চলছিল। লণ্ডনে নাটক খুলতে আরও এক সপ্তাহ বাকি। কার্ণোর নির্দেশে সারা সপ্তাহটা চার্লি নাটকটা দেখে কাটাল। বিশেষ করে যে ভূমিকাটি চার্লিকে করতে হবে সেটা সে খুবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। অভিনেতার

নীরস নিষ্প্রাণ অভিনয়ে খুবই হতাশ হলো চার্লি। মনে মনে ছকে ফেলল কেমন করে ভূমিকাটাকে আরও মজাদার আরও আরও প্রাণময় ব্যঞ্জনার ছোঁয়া লাগিয়ে সৃষ্টিধর্মী করে তোলা যায়।

মাত্র দুদিন নাটকের মহড়া দেওয়ার সুযোগ হলো। কে দেখাবে? ওয়েলডন ব্যস্ত তার গল্‌ফ্‌ খেলা নিয়ে। এর বেশী সময় সে দিতে পারবে না। মহড়ার সময় চার্লির ধীরে ধীরে পড়া ওয়েলডনকে ভাবিয়ে তুলল, চমক লাগানো তো দূরের কথা। এদিকে সিডনিও কাছে নেই। কার্ণোর অন্য দলের সঙ্গে লণ্ডনের বাইরে গেছে নাটক করতে। এ ভূমিকাটা সে আগে করেছে। চার্লিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে সেই পারত।

যাহোক যথারীতি ফুটবল খেলা নাটক মঞ্চস্থ হলো। ওয়েলডন আসার আগে সবাই যেন রামগরুড়ের ছানা হয়ে বসে থাকে। যেই না ওয়েলডন এলো সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো হাসির হো হো হল্লা। উদ্বোধনী রজনীতে প্রচণ্ড স্নায়ুর চাপ অনুভব করল চার্লি। আজই জীবনের প্রতিষ্ঠার দরজা হয় তার সামনে খুলে যাবে। না হয় বন্ধ হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে ঢংঢং করে শুরুর ঘণ্টা বাজল। শুরু হলো কনসার্ট। ঢুকে পড়েছে কোরাস দল। শুরু করেছে গান। ওরা বেরোলেই চার্লির ঢোকার কথা। বেরিয়েছে ওরা, মঞ্চ ফাঁকা। কপাল ঠুকে ঢুকে পড়ল চার্লি। হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার। যা হয় হবে। চার্লি আর ভয় পায় না কোনও কিছুতেই। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার প্রতিক্রিয়া। না; চার্লিকে দর্শক নিয়েছে। নাহলে সবাই এত চুপচাপ কেন?

মস্তিষ্কের গভীরে প্রতিক্রিয়া টের পাচ্ছে চার্লি। দর্শকের দিকে পেছন ফিরে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে ঢুকেছে চার্লি। এটা ওর নিজেরই সংযোজন। পোষাকের ব্যাপারটিও নিজের। ফুলবাবু সেজেছে। উঁচু টুপি, হাতকাটা কোট, হাতে লম্বা ছড়ি, আর গুড়গুড়িয়ে শামুকের মত হাঁটা ভাবভঙ্গী সব মিলে মিশে রাজা এডওয়ার্ডের এক সাক্ষাৎ

খলনায়ক। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল চার্লি দর্শকের দিকে। গাঢ় লাল রঙয়ের নাকটা দেখে দর্শকরা হেসে কুটোকুটি। দর্শক যে চার্লিকে নিয়েছে সেটা বোঝা গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাঁটতে শুরু করল চার্লি। একদিকে সোজা গিয়েই আবার হঠাৎ দিক পাল্টে অন্য দিকে। মঞ্চের এক কোণে পড়ে ছিল একটা ডাম্বেল। হঠাৎ দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেই তিড়িং বিড়িং করেই লাফিয়ে উঠল চার্লি। তাতে করে ছড়িটা আটকে গেল বক্সিং লড়বার ঝোলানো ব্যাগটাতে। যতবারই ছড়ি ছাড়াতে যায় ততবারই ছিটকে এসে চার্লির গালে সাঁই করে লাগে বালির ব্যাগ। ছিটকে বাড়তে বাড়তে কোনও রকমে কাঁচুমাচু মুখে নিজেকে সামলে নেয় চার্লি। এদিকে দর্শকরা তখন দমফাটানো হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছে।

মন থেকে উদ্বেগ আর অশান্তি বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল। নিজেকে চার্লির খুব হালকা লাগ্ছে। মাথার মধ্যে ঘুরছে একের পর এক উদ্ভাবনী কৌশল। এখন ইচ্ছে করলে কোনও কথা না বলে পাঁচ ছয় মিনিট অনায়াসে দর্শকদের মাতিয়ে রাখতে পারে চার্লি। নিশ্চয়ই পারে চার্লি। পরণে খুবই ঢোলা প্যান্ট। ঢলঢল করতে করতে বারবারই প্যান্টটা খুলে যাচ্ছে। বোতামটা ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে। চার্লি এক হাতে মুঠো করে প্যান্ট ধরে আধো আধো পায়ে হেঁটে সেই বোতামটা খুঁজতে লাগল অনুসন্ধানী চোখে। এদিকে সেদিক তাকিয়ে অনেক খুঁজে বোতামের মত দেখতে কি একটা যেন হাতে তুলে নিল। নাঃ, জিনিসটা কালো মত দেখতে কি একটা যেন। ভুল ভাঙ্গল, বোতাম নয় জেনে। অমনি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় ছুড়ে ফেলে দিল সেটা। অস্ফুট উচ্চারণে বলে উঠল, "কি যে দিনকাল পড়েছে। কারা যে রাস্তায় এত খরগোশ ফেলে রাখে!" কথা শেষ না হতেই হাসিতে ফেটে পড়ে দর্শক।

এদিকে মঞ্চের উইংসের আড়াল থেকে ওয়েলডনের মাথা দেখা গেল চাঁদের মতই। হাসি হাসি মুখ, এতক্ষণ অব্দি একজন দর্শকও

হাসেনি এতদিন। সবাই ঝিম মেরে বসে থাকত যতক্ষণ না ওয়েলডন মঞ্চে আসে। চার্লিই প্রথম সবাইকে পেট পুরে হাসাল। যেই মুহূর্তে ওয়েলডন মঞ্চে ঢুকল সঙ্গে সঙ্গে চার্লি খপ্ করে চেপে ধরল তাঁর হাত। হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলো একেবারে দর্শকদের সামনে। "মুশকিল হয়েছে। চটপট একটা সেফ্‌টিপিন দিন তো। আমার বোতামটা যে কোথায় হারিয়ে গেল।"—চার্লির শেষ না হতেই আবার হাসির হল্লা। এটা পুরোপুরি চার্লির বানানো কথা। মহলার সময় কখনও বলে নি। কিন্তু ওয়েলডনও ঝানু অভিনেতা, বুঝলেন সব। মানিয়ে নিলেন সহজেই। তখন অবশ্য দর্শকদের মধ্যে চার্লি-আগেই তৈরী করে রেখেছে এক হাসির পরিবেশ। এখন ওয়েলডনের কাজ হলো তাঁর নিপুণ অভিনয়ের ঠাস বুনোবো সেটাকে টড়ানো আর ছড়ানো। খুব প্রাণ খুলে অভিনয় করলেন। অন্য দিনের চেয়ে দশগুণ হাততালি জুটল। থামতেই চায় না যেন। চার্লি আর ওয়েলডন মিলে কত কি যে মজার কাণ্ডকারখানা করল—শেষ হলো কেবলমাত্র পর্দা নেমে আসতে। দলের অনেকে তো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল চার্লিকে। শুধু শুকনো গলায় সাজ ঘরের দিকে যেতে যেতে কোনও রকমে যেন ওয়েলডন বলতে পারলেন—"ভালোই করেছ—ভালোই তো!"

সে রাতে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলো চার্লি। এক গভীর আনন্দে কেন যেন চোখ ফেটে জল আসতে চায় ওর। ইচ্ছে হয় মন খুলে কাঁদে একা-একা। পথে ওয়েস্টমিনিস্টার সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নদীর কালো জলের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। না—কান্না এলোনা। চোখ শুকনো! চোখ রগড়ে আবার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হলো নদীর বুকে। কাউকে এ সময় মনের কথা বলতে পেলে খুব ভালো লাগতো। হালকা হতো বুকটা। কিন্তু কে শুনবে। সিডনিতো কাছে নেই। নিজের সংগে নিজেই কথা বলে চলে চার্লি কত কথা। পুরোনো সেই দিনের কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে

ছোটবেলায় এক রাজমিস্ত্রির যোগানদার হিসাবে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রীজের অনেকটা অংশ রং করেছে চার্লি। আস্তে আস্তে ওয়েস্ট-মিনিস্টার ব্রিজ থেকে হেঁটে হেঁটে এ্যালিফ্যাণ্ড এণ্ড ক্যাসল এর সামনে এক কফিখানাতে এসে ঢুকলো চার্লি। কালো কফির উষ্ণ উত্তাপে সজীব হলো মন। ধুয়ে মুছে গেলো ব্যথা বেদনা। যৌবনের ধর্মই যে টলটলে জলের মত দাগ পড়েনা বেশীক্ষণ। কফিখানা থেকে বেরিয়ে চার্লি আবার হাঁটতে লাগলো কেনিংটন গেটের দিকে। সেখানে জমকালো রেঁস্তোরাতে দামী চা পান করে আবার বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়ালো। সারাটা পথ চার্লি একা একাই কথা বললো। হাসলো মাতালের মত। ভোর পাঁচটাতে যখন বাড়ি ফিরলো তখন পুবের আকাশ লাল। কোন রকমে বিছানায় গিয়ে শুতেই গাঢ় ঘুমের গভীরে ডুবে গেলো চার্লি।

'ফুটবল খেলা' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে কার্নো ছিলেন না। বাইরে গেছিলেন কাজে। ফিরে এসে সব শুনেই আহ্লাদে আটখানা। তৃতীয় দিনের অভিনয় নিজে দেখলেন আগাগোড়া প্রথম সারিতে বসে। নাটক শেষে খুব খুশি মনে চার্লির সংগে করমর্দন করলেন। জানালেন চার্লি যেন পরদিন সকালেই অফিসে যেয়ে বাৎসরিক পাকা চুক্তিপত্রে সই করে নেয়। সপ্তাহে চার পাউণ্ড মাইনে ঠিক হলো।

চুক্তিতে সই করেই চার্লি সিডনিকে টেলিগ্রাম পাঠালো। লণ্ডনে চৌদ্দ সপ্তাহ এক নাগাড়ে চললো ফুটবল। তারপর দল বেরিয়ে পড়লো ভ্রমণ-সূচি নিয়ে বাইরে।

এদিকে ওয়েল্ডন মনে মনে খাপ্পা হয়ে উঠছিলেন চার্লির অভিনয় ক্ষমতাতে। জনপ্রিয়তা ও দিন দিন বাড়ছে চার্লির। এক ধরণের হাবাগোবা ন্যালাখ্যাপা ক্যাবলা গোছের অভিনয়ে লোক হাসাতো ওয়েল্ডন। নিছক স্থূল ভাঁড়ামি। বুদ্ধির কোন চমক ছিলোনা তাতে। দর্শকরা—বিশেষ করে উত্তর ইংল্যাণ্ডের দর্শকরা খুব নিতো

ওয়েল্ডনকে। কিন্তু দক্ষিণ ইংলণ্ডে বিশেষ করে, ব্রিস্টল, সাউথাম্পটন কার্ডিফ, প্লাইসাউথের দর্শকেরা ওয়েল্ডনের হাবাগোবা মার্কা স্থূল ল্যাকাশায়ারী অভিনয়ের ভাঁড়ামোতে ভুলতোনা। ব্যস্—দক্ষিনের কোন শহরে গেলেই ওয়েল্ডনের মুখ হাঁড়ি হয়ে যেতো। মনের অস্থিরতা বাড়তো। অভিনয়ের দৃশ্যে যেখানে চার্লিকে বড় সারার ভঙ্গি করার কথা থাকতো সেখানটাতে সজোরে চড় কষাতে ওয়েল্ডন। চার্লির মাঝে মাঝে মনে হতো হিংসে করেই এরকম দেড় মারতো ওয়েল্ডন।

সেবারে দল বেলফাস্টে গেছে। কাগজে সমালোচনা বেরুলো। তাতে ওয়েল্ডনকে খুব গালাগাল করে সমালোচনা করেছে। চার্লিকে বরং প্রশংসা করেছে ওর বুদ্ধিদৃপ্ত কৌতুকাভিনয়ের জন্য। ব্যস্—আর যায় কোথায়-অবস্থা চরমে উঠলো। হিংসায় রাগে অন্ধ হয়ে উঠলেন ওয়েল্ডন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নাটকের অভিনয় দৃশ্যে চার্লিকে এমন জোরে চড় কষালেন যে দর্শক শুদ্ধ অ্যাৎকে উঠলো। চার্লিরতো মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। অনেক কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে অভিনয় দৃশ্য শেষ করলো চার্লি। অভিনয় শেষে চার্লি সোজা ওয়েল্ডনকে শাসালো, "লজ্জা করে না বুড়ো হয়েছেন এখনো এত হিংসে কিসের! আর যদি কখনো ও রকম থাপ্পড় মারবেনতো—সোজা আপনার মাথার ডাম্বেল ঝাড়বো—মগজের ঘিলু বের করে ছাড়বো। বড্ডো বাড় বেড়েছে।" চার্লির কথা শেষ না হতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো ওয়েল্ডন। কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতে ছাড়লেন না চার্লিকে। 'তোর মত পুঁচকে ছোঁড়াকে হিংসে করবো আমি। আমার নাম ওয়েল্ডন। তোর মত বালকের যোগীর ভালোমন্দ গুণতো আমার পায়ের কড়ে আঙ্গুলে থাকে রে।' চার্লিও কম যায় না শুনে বলে উঠলো, 'তাতো ঠিকই আপনার তার প্রতিভা তো পায়ের করে আঙ্গুল থেকে বেরোয় কিনা। ওটাইতো আপনার শরীরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা কিনা।'

বলেই এক ছুটে সাজঘরের দিকে ছুটলো চার্লি।

॥ তেরো ॥

১৫, গ্র্যানশ্ ম্যানসন। ব্রিকস্টন রোড। চার্লিদের নতুন নেওয়া ফ্ল্যাট। সিডনি আর চার্লি দুজনই ভালো রোজগার করছে আজকাল। মনের মত করে সাজিয়ে তুললো নতুন বাসা। খরচ হলো চল্লিশ পাউণ্ডেরও বেশী। চার্লি আবার পনেরো পাউণ্ড খরচ করে নিয়ে এলো মেহগনি কাঠের কারুকাজ করা পিয়ানো। না হলে নাকি ঘরের আভিজাত্য ঠিক খোলেনা। দেয়ালে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো এক বিবসনা নারীর অলৌকিক ছবি। মোট চারখানা ঘর। সব ঘরেই রয়েছে আসবাবপত্র। বাইরের বসার ঘরটা আগাগোড়া ঝলমলে কার্পেটে মোড়া। বাকী ঘরগুলো মোড়ানো হলো লিনোলিয়মে। বসলে আদ্দেক শরীর ডুবে যায় এমন গদীমোড়া একপ্রস্থ চেয়ারও এলো। বাইরের ঘরে ঝোলানো হলো চিকের এক পর্দা। তার আড়ালে জ্বললো হলুদ রঙের আলো। বাতি জ্বালালে ঘরখানা হয়ে ওঠে যেন স্বপ্ন পুরী। যখনই অভিনয় থাকতোনা লণ্ডনের বাইরে তখন দু'ভাই মিলে গ্র্যানশ ম্যানসনের সে বাড়িতে থাকতে ভালবাসতো। সেই একটুকু বাসার টান তাদের কাছে হয়ে উঠলে স্বর্গের মতই আকর্ষণীয়। বাসা ছেড়ে বাইরে যেতে মন চাইতোনা চার্লিদের। যদিও ঘরে ময়লা বা নোংরা হওয়ার কোন ব্যাপার নেই। একটা জিনিস ও ঘরের ছুঁয়ে দেখেনা চার্লি বা সিডনি। তবুও ঝি রাখা হলো। না হলে মান বাড়েনা। আভিজাত্যে পালিশ পড়েনা। আগুন-চুল্লীর আগুন উসকে দেবার জন্য পেতলের এক শিক করালো চার্লি, তাতে আবার চামড়া মোড়া হাতল। গদীমোড়া চেয়ারে আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে মাঝে মাঝে আগুণ উসকে দেওয়ার এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতো চার্লি।

টানাটানিরতো কথাই উঠেনা—স্বচ্ছল চার্লি আর সিডনি দাদামশায়কে প্রতি সপ্তাহে দশ শিলিং করে হাত খরচ দেয়। এক কথায় খুব সুখেই আছে এখন চার্লিরা। ষোল বছর বয়সের চার্লির সেই রোমান্টিক ভাবালুতায় ভরা মনটা যেন ফিরে আসে। বড় হবার—অনেক অনেক বড় অভিনেতা হবার সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠতে থাকে চার্লি। এক নতুন অনুভূতির রাজ্যে একা একাই সাঁতার কাটতে থাকে সে। বুঝতে পারছে। একটু একটু করে কমলালেবুর খোসা ছাড়ানোর মত করেই ওর ভেতরকার মনের আস্তরণ সরে যেতে থাকে। বদলে যাচ্ছে চার্লি। বদলে যাচ্ছে ভালোলাগা না লাগা, ইচ্ছে-আনন্দ-মেজাজ সবকিছু। না—তারজন্য চার্লির কোন অনুতাপ নেই। দুঃখ নেই। যন্ত্রণা নেই। কোন কিছুই নেই। শুধু সব ঘিরে সবার ওপরে এক অনাবিল ভালো লাগার স্বাদ রক্তের গভীরে খেলা করে। আর পড়ে থাকে আনন্দ। বেঁচে থাকা খুবই পবিত্র আর মাধুর্য্যময় মনে হয়।

॥ চৌদ্দ ॥

চার্লি উনিশে পড়েছে। এ বয়সেই ফ্রেড্ কার্ণোর দলের সে একজন মুখ্য অভিনেতা হয়ে উঠেছে। দলে তার প্রচণ্ড সুনাম। বড় অভিনেতা বলে বাইরেও যথেষ্ট খাতির জোটে। অর্থেরও অভাব নেই। কিন্তু কি যেন এক শূন্যতা অভাববোধ চার্লিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঋতু পরিবর্তনের বৈচিত্র্য আসে, বসন্ত, গ্রীষ্ম—চলেও যায় চার্লির অজান্তেই। কোনও ছাপ পড়ে না ওর মনে। কেমন যেন রুটিনমাফিক, একটানা একঘেয়ে জীবন। আসলে বড় একা লাগে। নিজেকে নির্জন মনে হয়। হাঁটতে হাঁটতে বিষাদাচ্ছন্ন মন নিয়েই পার্কে গিয়ে বসে। ছেলেদের ব্যাণ্ড বাজনা শোনে। এক সময় ফিরেও আসে। কোনও কিছুই মনকে নাড়া দেয় না। সব যেন কেমন পুরনো, বিবর্ণ ছবির মত মনে হয়।

অবশেষে একদিনের এক ঘটনা চার্লির মনকে ভীষণ রকম ছুঁয়ে গেল। তখন স্ট্রীথাক এমপায়ার মঞ্চে অভিনয় চলছে চার্লিদের। কোনও কোনও রাত্রে পর পর দুটো তিনটে অভিনয় চলত। দলের নিজস্ব গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ওরা। সেদিন স্ট্রীথামে এদের ছিল সন্ধ্যেবেলার অভিনয়। সেখান থেকে অভিনয় শেষে ওরা যাবে ক্যাণ্টারব্যারি জলসাঘরে। তারপর তিভোলিতে। দুপুর থাকতে থাকতেই শুরু হলো নাটক। গরমও বেশ পড়েছে। সে প্রায় ফাঁকা অভিনয় করে মন ভুলল না চার্লির। চার্লিদের আগে আগে বাসে করে চলেছে অ্যামেরিকান মেয়েদের একটি নাচিয়ে গাইয়ে দল। নামটাও অদ্ভুত। নাম Yankee-Doodle Girls.' পর পর কদিন এক জায়গাতেই অভিনয়। প্রথমে মেয়েরা নাচগান করবে। তারপর চার্লিরা। সাজসজ্জা সেরে উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে চার্লি মেয়েদের নাচ দেখছে। একটি মেয়ে নাচতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেল। বাকি সবাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে দেখে হাসতে লাগল। চার্লিও হেসে ফেলল। এমন সময় চার্লির

চোখে পড়ল গাঢ় বাদামী রঙের এক জোড়া চোখ। ওর দিকে তাকিয়েই হাসছে। ডিমের মত গোল ভরাট মুখে সুন্দর সাজানো দাঁত চার্লির শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। মেয়েটি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল একটু পরেই। হাতে ধরা ছোট্ট আয়না। চার্লিকে দেখেই হেসে বলল "একটু আয়নাটা ধরুন তো। চুলটা ঠিক করে নিই। চার্লিও সুযোগ পেল খুব কাছ থেকে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখার। এভাবেই শুরু। পরের রবিবারে মেয়েটি চার্লির সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারবে কিনা জেনে নিল চার্লি। মেয়েটি সুন্দর করে হাসল—"এখনও তো ভালো করে আপনাকে চিনতেই পারলাম না। রোজ শুধু লাল নাকটাই দেখি।" "নাকটা তো আমার সত্যি সত্যি লাল নয়। তোমার মতই দেখতে। ঠিক আছে, পরের রাতে আমি তোমাকে আমার ছবি এনে দেখাব, তাহলে বিশ্বাস হবে তো?"

পরদিন চার্লি তার সদ্য যৌবনের ছবি এনে দিল মেয়েটির হাতে। ভালো টাই পরা বিষণ্ণ চোখের স্থির দৃষ্টিতে ভরা থমথমে মুখের ছবি। "আপনি তো ভীষণ ছেলেমানুষ। আমি আপনাকে আরও অনেক বড় ভেবেছিলাম।"

"কত বড়?"

"তা কম করে তিরিশ তো বটেই।"

"সবে উনিশে পড়েছি। তিরিশ বছর আসতে এখনও অনেক দেরী।" চার্লি হাসল। ঠিক হলো রবিবার বিকেল চারটেতে কেনিংটন গেটের কাছে মেয়েটির সঙ্গে চার্লির দেখা হবে। চার্লি পরল হাল্‌কা কাল্‌চে রংয়ের দামী স্যুট। সঙ্গে মানান সই গাঢ় রঙা টাই। হাতে নিলো হাতির দাঁতের কালো হাতল দেওয়া ছড়ি। চারটে বাজার দশ মিনিট আগেই চার্লি পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট জায়গাতে। আকাশে তখন বেশ ঝলমলে রোদ। প্রকৃতিকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। চার্লির অন্ততঃ তাই মনে হলো। এক একটা ট্রাম আসছে। যাত্রীরা নামছে এক এক করে। চার্লি সবাইকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

এদিকে চার্লির পক্ষে এক সমস্যা হয়ে উঠল মেয়েটিকে চিনতে পারা। সব সময় মেয়েটির অতিরিক্ত সাজগোজ করা মুখটিই সে দেখেছে। এখন রং না মাখা মুখটা ঠিক মনে করতে পারছে না। কেমন দেখতে হবে তাকে ? খুব বাজে দেখতে কি ? এদিকে তখনও মেয়েটি এসে পৌঁছয়নি। চারটে বাজার তিন মিনিট আগে ট্রাম থেকে নেমে ভয়ংকর মোটা কুৎসিত চেহারার একটি মেয়ে চার্লির দিকে এগিয়ে আসতেই আঁতকে উঠল সে ভয়েই। এখন আর ভেবে কোন লাভ নেই। চার্লি অতি কষ্টে হাসি হাসি মুখ করে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলল। মহিলাটি চোখ কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে না থেমে সোজা চলে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল চার্লির। অনেক বাঁচোয়া। সময় গড়িয়ে চলেছে। চারটে বাজতে এক মিনিট বাকি। একখানা ট্রাম থামল। একটি যুবতী মেয়ে ট্রাম থেকে নামল। চার্লির দিকে তাকিয়ে হাসল। চার্লির পাশে এসে দাঁড়াল। মুখে কোনও সাজগোজ নেই। মাথায় হালকা জাহাজী টুপি। সমুদ্র রঙা ঝোলা কোট পরণে। তাতে পেতলের বোতাম। কোটের পকেটে অনায়াসে দুহাত ঢোকানো। চার্লি তো বিস্ময়ে হতবাক্। মঞ্চের চেয়ে হাজারো গুণ বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। চার্লির দিকে চেয়ে মুখ টিপে হেসে মেয়েটি বলে উঠল—"এই তো আমি।" ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজনায় ঘেমে উঠল চার্লি। ভেতরটা যেন কাঁপছিল। মুখে কোনও কথাই জোগাল না কতক্ষণ। চিন্তা ভাবনাটুকু করার শক্তিটুকুও যেন নিঃশেষিত। এত সুন্দর দেখতে! শুধু চোখে পড়ল সামনের রাস্তা। কোনও রকমে চার্লি বলে উঠল, "তাহলে একটি ট্যাক্সি নিই।" বলেই চার্লির খেয়াল হলো কোথায় যাবে তারও তো কোনও ঠিক নেই। পুনরায় বলে উঠল। "কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?"

"যেদিকে খুশী" মেয়েটি বলল ঘাড় ঝাঁকিয়ে।

"বেশ তাহলে চল ওয়েস্ট এণ্ডে যাই, ডিনার খাব।"

"আমি কিন্তু বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।"

"ঠিক আছে সে পরে ভাবা যাবে। আগে তো ট্যাক্সিতে ওঠা যাক।"

চার্লি তার বান্ধবীকে নিয়ে ঢুকল ট্রোকাডারোতে। শহরের সবচেয়ে অভিজাত রেস্তোরাঁতে। বাজে সেখানে বাজনা। ছন্দের তালে তালে ঝংকৃত হয় পরিবেশ। এখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের ভীড়। বিচিত্র খাদ্য এবং প্রানীদের অঢেল সমারোহ। বেড়াবে বলে ব্যাংক থেকে তিন পাউণ্ড তুলে এনেছিল চার্লি। মুখোমুখি টেবিলে বসে দুজনে ডিনার খেতে বসল। খাওয়ার ভান করল বলা যায়। পড়ে রইল সবাই। হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে দাঁড়াল টেমসের তীরে। ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে তিন পাউণ্ডের বাকি পয়সাগুলো অবলীলায় জলে ছুঁড়ে ফেলল চার্লি।

পরদিন সকালে সাতটায় হেটির সঙ্গে চার্লির সঙ্গে দেখা হলো। চার্লি নিজেই গেল ক্যাম্বারওয়েল রোডে হেটিদের বাড়ীতে। আটটাতে হেটি যাবে মহড়া দিতে। চার্লি ওকে পৌঁছে দেবে। কয়েকটা দিন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল চার্লির। তারপর হঠাৎ-ই একদিন হেটির আচরণ গেল বদলে, কেমন যেন অদ্ভুত, ছাড়াছাড়া ভাব। আসলে পনেরো বছরের হেটি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শিখেছিল চার্লির সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না। চার্লি ভীষণ ছেলেমানুষ। অথচ চার্লি সেটা না বুঝে অভিমানী, অবুঝ, অবাধ্য বালকের মতই হেটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে বসে। হেটি নিরুত্তর। বিষয়টির সমাধানে এগিয়ে এলেন হেটির মা। চার্লির সঙ্গে হেটির মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন তিনি। এরপরেও আরও পাঁচবার চার্লির সঙ্গে হেটির দেখা হয়েছে। প্রতিবার কুড়ি মিনিট করে মোট একশো মিনিটের জন্য। সময়ের কষ্টি পাথরে খুবই যৎসামান্য সময় তবুও প্রতিবারই চার্লির মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল তা। প্রতিটি সাক্ষাৎকারই এক দীর্ঘস্থায়ী বিধ্বংসী চিহ্ন রেখে গেছে চার্লির সামগ্রিক জীবনে।

॥ পনেরো ॥

১৯০৯। চার্লির প্রথম প্যারিস ভ্রমণ। ফোলিয়ে বার্জারের সর্বেসর্বা ছিলেন মঁসিয়ে বার্ণেল। কার্নো কম্পানিকে তিনি একমাসের চুক্তিতে অভিনয় করার আমন্ত্রণ পাঠালেন। একমাস ধরেই প্রতিদিন অভিনয় হবে। নামকরা রঙ্গমঞ্চে। থাকা খাওয়া বন্দোবস্ত সবই বার্ণেলের উপর। খবরটা জেনে মনটা আনচান করে উঠল প্যারিস যাওয়ার জন্য। লণ্ডনকে তখন যেন ক্লান্তিক আর ঘিঞ্জি মনে হচ্ছিল চার্লির কাছে। রবিবারে যাত্রা শুরু হলো। ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ঝড় বৃষ্টি আর থমথমে কুয়াশা ঘেরা দমকা বাতাস পেছনে ফেলে রেখে ডোভার থেকে ক্যালেতে এসে পৌঁছল চার্লিরা। ক্যালে থেকে প্যারিস।

অনেকদিন আগেই চার্লির পূর্বপুরুষরা ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে এসে গড়ে তুলেছিলেন চ্যাপলিন বংশের আর এক শাখা। চার্লি এখন বাপ কাকার স্বপ্নমাখা সেই ফ্রান্সে। গমগম করছে রাজপথ। আলোয় আলোয় চারদিকে ঝলমলানো রোশনাই। পথের ধারে খোলা আকাশের নীচে চেয়ার টেবিল বসানো ছোট ছোট কাফে।

চার্লি বেরিয়ে পড়ল পথে। যাবে ফোলিয়ে বার্জারে। পরের দিন থেকে ওদের নিয়মিত অভিনয় শুরু হবে। প্রেক্ষাগৃহ দেখে চার্লি তো বিস্ময়ে হতবাক্। স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর সে রঙ্গমঞ্চ। কি সুন্দর সব দৃশ্যপট চতুর্দিকে। সুবেশ নরনারীর এক রংবাহারী মেলাই যেন বসে গেছে। প্রেক্ষাগৃহে মাথার টুপিতে দোভাষী লেখা কিছু লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাবার্তা না বুঝতে পারায় খুবই অসুবিধে হচ্ছিল চার্লির। ভাব জমালো তাই এক দোভাষীর সঙ্গে। কনিয়াক

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চার্লি পরিপূর্ণ স্বাদের আমেজ উপভোগ করে চতুর্দিকে ভীড়ে মেশা প্রতিটি মানুষের আচার আচরণ দেখে। দেখে দেখে খুব ভাল লাগে। আশ যেন আর মেটে না।

প্যারিতে আসা সার্থক মনে হয়। হোক্ না যে ঘরটায় চার্লি উঠেছে তাতে নেই কার্পেট, পাথরের মেঝে কনকনে বরফের মত ঠাণ্ডা। নেই পর্য্যাপ্ত ঠাণ্ডা গরম জলের বন্দোবস্ত। তবুও তো এই সেই প্যারি। মোনেত, পিসারো আর রেনোয়াঁর স্বপ্নের জগৎ। আর অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটিকে চার্লির মনে হয় বাস্তিলের সেই বিখ্যাত দুর্গা। চার্লি যেন তার স্বপ্নের স্বর্গেতে থাকার সুযোগ পেয়ে কেমন যেন অহংকারী হয়ে উঠল।

প্যারির বাসিন্দারা ভালভাবে নিল চার্লিদের নাটক। দারুণ প্রশংসা পেল। দর্শকের অনুরোধ আসতে লাগল আরও কিছুদিন নাটকটা চালানোর জন্য। কিন্তু তাতো হওয়ার উপায় নেই। মাপা প্রোগ্রাম কার্নোর দলের। সময়মত ফিরতেই হবে। প্যারিসে থাকার সময় চার্লি মাইনে পাচ্ছিল ছ পাউণ্ড করে। দুহাতে সব পয়সা ওড়াচ্ছিল। খাওয়াদাওয়া ঘোরা প্যারিস্সে পয়সা ও ভাবার অনেক পথ। সিডনির এক খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে চার্লির। যেচে এসে পরিচয় দিল। প্যারিসেই থাকে। প্রচুর পয়সার মালিক। গাড়ী করে সমস্ত দর্শনীয় স্থান ঘোরাল চার্লিকে। ভালভাল জায়গাতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াল। বিনিময়ে চার্লি মঞ্চে বসে ওদের নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানাল। বেচারার বড় সখ নাটক দেখার। রোজই নাটক দেখতে আসে। কিন্তু হঠাৎ জরুরী ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে মনে আফ্‌সোফ নিয়ে সিড্‌নির খুড়তুতো ভাই চলে গেল অ্যামেরিকা। চার্লিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এ সময় চার্লি খবর পেল হেটি প্যারিসে এসেছে নাচের দলের সঙ্গে। চার্লি একদিন দেখা করতে গেল। তবে দেখা পেল না। প্যারিসের শুঁড়িখানা চার্লিকে প্রলুব্ধ করে তুলল। একদিন তো

প্রচণ্ড মদ খেয়ে আর্নিংস্টোনের সঙ্গে বক্সিং করে ফেলল আর্নিং আবার পুরনো দিনের ঝানু চ্যাম্পিয়ন। শুরু হলো তুমুল ঘুষোঘুষির লড়াই। রেস্তোরাতে লোকজন জমে গেল। হৈ-হট্টগোলে এলো পুলিশ। ছড়িয়ে দিল দুই মাতালকে। টলতে টলতে ভোর চারটে নাগাদ চার্লি আবার ঢুকল স্টোনের ঘরে। দুজনে একই হোটেলে থাকে। লড়াইটা নাকি তখন তেমন জমে নি। জামা জুতো খুলে হাঁটু অবধি প্যাণ্ট গুটিয়ে নিয়ে খালি গায়ে শুরু হলো লড়াই।

দুই বন্ধুতে তুমুল ঘুঁষোঘুঁষিতে দুই বন্ধু যৎপরনাস্তি আহত হলো। আচমকা চ্যাম্পিয়ন স্টোনের এক ঘুঁষি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল চার্লি। ভোরবেলা চার্লির ঘরে চা দিতে এসে ছোট মেয়েটা তো আর্ত চীৎকার করে উঠল ভয়ে। মুখের কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে ঘাড়ের কাছে জমাট বেঁধেছিল চার্লির। মেয়েটি ধারণা করল চার্লি আত্মহত্যা করেছে। চীৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠল চার্লি। এরপর থেকে মদ খেয়ে মাতলামো আর মারপিট করেনি চার্লি।

একদিন, অভিনয় শেষে দোভাষী বন্ধু এসে জানাল এক প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ নাকি চার্লির সঙ্গে দেখা করতে চান। রাশিয়ার ব্যালে দলের সঙ্গে প্যারিসে এসেছেন। চার্লি গেল আলাপ করতে। ভদ্রলোক বললেন চার্লির অভিনয় নাকি তাঁর খুবই ভাল লেগেছে। তবে চার্লির যে এত কম বয়স সেটা বুঝতে পারেন নি তিনি। ভদ্রলোক চার্লিকে জানালেন শুধু নাচগানে নয়, অভিনয়েও চার্লি ওস্তাদ। বিনম্র অভিবাদনে চার্লি সেই শিল্পীকে অভিনন্দন জানাল। ঐ সঙ্গীতজ্ঞ ভদ্রলোক ছিলেন রাশিয়ার বিখ্যাত সুরকার দেবুসি। অনেক পরে ইংলাণ্ডে দেবুসির সুরে অভিনীত হয়েছিল এক গীতি-নাট্য। তবে চার্লির ভাল লাগে নি। খুব একঘেঁয়ে মনে হয়েছিল।

শেষ হলো চার্লিদের অভিনয় সফর। আবার ফিরে এল ইংল্যাণ্ডে। দেখতে দেখতে ছমাস কেটে গেল। একঘেয়ে

নিরানন্দ জীবন। প্যারিসের সেই প্রাণ চঞ্চলতা, লণ্ডনে কখনই পাওয়া যায় না। দলের সঙ্গে চরকির মত ঘুরে চলেছে চার্লি। এমন সময় ফ্রেড কার্ণো বিশেষ জরুরী চিঠি পাঠাল। 'ফুটবল' নাটকে এখন থেকে হ্যারিওয়েলডনের ভূমিকাটি চার্লিকেই করতে। যদিও এর আগে দু তিনটি কৌতুক নক্সাতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে চার্লি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল, তবুও 'ফুটবলে'র ভূমিকার ধারে কাছে যায় না সেসব। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল চার্লির হৃদয়। তবে কি তার সৌভাগ্যের নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে!

চার্লি যেন মনঃচক্ষে দেখতে পেল। বিজ্ঞাপনের মাথায় জ্বলজ্বল করছে বড়বড় অক্ষরে লেখা চার্লির নাম। অক্সফোর্ডের রঙ্গমঞ্চের জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধজনের সমাবেশে মুখ্যভূমিকার অভিনয় করে চলেছে চার্লি। সবাই হাততালি দিচ্ছে ও উচ্ছসিত প্রশংসা করছে! নিজেকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে চার্লি। অনেক অনেক বেশী মাইনের দাবী বাধ্য হয়ে মেনে নিচ্ছে কার্ণো। চার্লিকে ভেবে চার্লির উপযুক্ত সংলাপ লিখে, লেখা হচ্ছে নাটক বা কৌতুক নক্সা। যে কোনও অভিনেতার পক্ষেই সেটা চরম গৌরবের। সাফল্য ঘোড়দৌড়ের মতই চার্লিকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এমনি নানারকম ভবিষ্যৎ চিন্তাতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল চার্লি।

চার্লি শুধু মনে মনে ঠিক করে নিল মুখ্য ভূমিকাটির অভিনয়ের ব্যাপারটি—চার্লি বলবে সমস্ত সংলাপ খোদ্ লণ্ডনের টানে। যেখানে হ্যারি কথা বলত ল্যাঙ্কাশায়ারের বাঁকা টান মিশিয়ে। এরকম আরও কয়েকটি জায়গা মনে মনে পাল্টে নিল চার্লি।

কিন্তু একি! সমস্ত স্বপ্ন যে ধূলিসাৎ হতে চলেছে। প্রথম মহলার দিন আতংকে পাগল হওয়ার উপক্রম হলো চার্লির। সে যে কি মর্মান্তিক অবস্থা! গলা দিয়ে চার্লির আর স্বর বেরোচ্ছে না! কত ওষুধ বিষুধ, টোটকা, কত চেষ্টা, কত কসরৎ সব ব্যর্থ। গলায় কিছুতেই আওয়াজ আর সাব্লে না। এদিকে হাতে আর মাত্র ছটা

দিন সময়। যে যা বলে তাহাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চার্লি। সেঁক দেয়, গলায় ওষুধ লাগায়। গরম জলের ধোঁয়া, ফিসফিস কথা বলে। তবুও গলার কোনও পরিবর্তন হয় না। অভিনয়ের দিন নিষ্প্রাণ ভাঙা মন নিয়ে মঞ্চে উঠল চার্লি। সর্বশক্তি দিয়ে দূরে—শব্দ নিক্ষেপ করার চেষ্টা চালাল। কিন্তু বৃথা!

দর্শকরা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না! কার্ণো ছুটতে ছুটতে এসে জানিয়ে গেল চার্লি যেন জোরে বলে। নাহলে দর্শক শুনতে পাচ্ছে না। অন্ততঃ চার্লি যেন আরও একটু জোরে বলার চেষ্টা করে। চার্লি কার্নোকে জানাল পরের দিন চেষ্টা করবে। মনে আশা বিশ্রাম পেলেই স্বর ফিরে আসবে। কিন্তু সব বৃথা। এক সপ্তাহ অক্সফোর্ডে এ অভিনয় চলাকালীনও চার্লির গলার স্বর পুনরুদ্ধার হল না। চার্লির কাছে সে যেন এক জীবন মৃত্যুর সামিল। নাটক চলছে। অভিনয় করছে। দর্শক চার্লির গলা শুনতে পাচ্ছে না। তারাই বা কত সহ্য করবে। চার্লির স্বপ্ন দেখা শেষ হলো। ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হলো চার্লির স্বপ্নের প্রাসাদ। শরীর ও মনের এই ভয়ানক নিপীড়ণ আর সকল সহ্য করতে পারল না চার্লি। অসুস্থ্য হয়ে পড়ল সে। প্রচণ্ড জ্বর হলো। বেশ কিছুদিন বিছানায় পড়ে রইল চার্লি।

কিছুদিনের মধ্যেই সেরে উঠল চার্লি। দলে যোগ দিল। কার্নোর দলের সঙ্গে অভিনয় করে চলল অন্যান্য নাটকে। গলাটা ঠিক হয়ে গেছে পুরোপুরি। কে বলবে একমাস আগে এত খারাপ হয়েছিল ওর গলাটা। সেদিন গলাটা ঠিক থাকলে চার্লির ভবিষ্যৎটাই হয়ত কত উজ্জ্বল হতে পারত। একেই হয়ত বলে ভাগ্যের পরিহাস। তবে হতাশাকে কখনই তেমন আমল দেয় না চার্লি। তবুও মনের কোণে প্রশ্ন জাগে ওয়েলডনের ভূমিকা নেবার—যোগ্যতা কি চার্লির আছে?

এদিকে ফ্রেড কার্নোর দলের সঙ্গে চার্লির চুক্তিও শেষ হবার

মুখে। চার্লি মনে মনে ভাবল নতুন চুক্তিকরার সময় কার্নোকে ওর মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলবে। কে জানে কি হবে?

চার্লি জানে ফ্রেড কার্ণো সবার চোখে যত নিষ্ঠুর আর অহংকারী হোক না কেন চার্লিকে খুবই ভালবাসেন। তবে এমনও হয়েছে কাউকে যদি একবার অপছন্দ করতে শুরু করেন তবে তার আর নিস্তার নেই।

একবার নাকি একজন অভিনেতা অভিনয় করছে মঞ্চে। অভিনয় জমছে না। কার্ণো উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে নাকে আঙ্গুল চেপে একটানা সাইরেন বাজিয়ে চললেন। সে যে একখানা শিঙ্গি ফোঁকা আওয়াজ। অভিনেতার তো পিলে চমকে যাওয়ার উপক্রম। দর্শক অব্দি সেই আওয়াজ শুনতে পেত। মঞ্চ থেকে না বেরোনো পর্য্যন্ত কার্ণো সেই আওয়াজ চালিয়ে যেতেন। সবাই বুঝত, অভিনেতার অন্ন ঘুচে গেল কার্নোর দল থেকে।

চার্লি কার্ণোর সামনে দাঁড়িয়ে। মাইনে বাড়ানোর দাবী পেশ করা হয়ে গেছে। কার্ণো স্থির দৃষ্টিতে চার্লিকে দেখতে দেখতে বললেন "থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তোমার উপর অসন্তুষ্ট। সেই অক্সফোর্ডে অভিনয়ের দিন থেকে। সবাই বলছে তুমি দলের সুনাম নষ্ট করে দিয়েছো। হেঁজিপেঁজি দলের সঙ্গে কার্ণোর দলের তফাত কি রইল? তোমার তো মাইনে কমানোর কথা বলছে ওরা। আর তুমি বলছ মাইনে বাড়াতে।" চার্লি কিন্তু কার্ণোর কথায় মোটেই দমল না। স্থির বিশ্বাসে জানাল, "দর্শকরা আমাকে নেয়, পছন্দ করে, আমার প্রশংসা করে। আমার মাইনে বাড়ালে ওরা খুশী হবে।"

আগে পাঁচ পাউণ্ড মাইনে পেত চার্লি। এখন চাইল ছয়। এও জানাল কার্নোকে দেওয়া না দেওয়াটা কার্ণোর উপর নির্ভর করছে। ইচ্ছে করলে চার্লিকে দল থেকে বাদও দিতে পারেন তিনি। যদিও

চার্লি মনে মনে জানে গাদাগাদা নাটকে চার্লির ভূমিকা রয়েছে। প্রচুর কাজ। বাদ দিতে চাইলেই তো আর বাদ দেওয়া যায় না। চার্লিকে বাদ দিলে কার্ণোর পক্ষে গোটা ব্যাপারটা সামলানোই দায় হবে। অগত্যা চার্লিরই জিত। রাজী হলেন কার্ণো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল চার্লি।

পুরোদমে অভিনয় চলছে চার্লির। ঠিক তখনই কার্ণোর আমেরিকার দলের হর্তাকতা আলফ রীভস ইংল্যাণ্ডে এলেন। দলের মধ্যে কানাঘুষো ছড়িয়ে পড়লো যে রীভস এসেছে বাছাই করে কয়েকজন কৌতুকাভিনেতাকে আমেরিকাতে নিয়ে যেতে। চার্লি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে অভিনয় করে চললো যাতে নির্বাচিত হয়। বার্মিংহাম মঞ্চে তরুণ চার্লি অভিনয় করছিলেন 'স্কেটিং' নাটকে। বলতে গেলে চার্লিই সব। মুখ্য অভিনেতা। রীভস একদিন চার্লির অভিনয় দেখলেন। পছন্দ হলো চার্লিকে। কিন্তু বিপদ হলো কার্ণোকে নিয়ে আমেরিকাতে যেতে দিতে তিনি রাজী নন। অনেক টানা-হ্যাঁচড়ার পর রীভসের মতে রাজী হলেন কার্ণো। তখনকার আমেরিকাতে যেহেতু অনেক গুপ্ত সমিতি ছিলো সেহেতু কার্ণো নাটক বাছলেন গোপন সমিতির এক সদস্যের কাজকর্ম নিয়ে এক নাটক—'আউ—আউ'। মুখ্য ভূমিকাতে অভিনয় করবে চার্লি। অবশেষে চার্লির আমেরিকা যাওয়া ঠিক হলো। চার্লির মনে দারুণ আনন্দ। ইংল্যাণ্ডের চেয়ে আমেরিকাতে কাজকর্মের পরীক্ষা নিরীক্ষার তখন প্রচুর সুযোগ। প্রতিভা, অধ্যবসায় আর যোগাযোগের সংমিশ্রনে নিজেকে যোগ্যতম প্রমাণ করা চার্লির পক্ষে সহজতম হবে সেখানে।

যাওয়ার আগের দিন চার্লি লণ্ডনের চেনা-অচেনা রাস্তাতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালো। লাইবেস্টার স্কোয়ার, কভেন্ট্রি স্ট্রীট, ম্যল, পিকাডিলীর পথে পথে পুরোনো দিনের মতই হাঁটলো স্মৃতির সিন্দুক হাতড়ে হাতড়ে। চার্লির মনে বিদায়-ব্যথা। জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বুকটা টন টন করে বাজে—তবু ছেড়ে যেতে হয়। চার্লি তখন

মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছে সে পাকাপাকি ভাবে আমেরিকার বাসিন্দা হবে।

খুব সকালেই ঘুম থেকে উঠলো চার্লি। জিনিসপত্র গোছগাছ আর বাধাছাঁদা করে তৈরী হলো। সিডনি তখন ঘুমোচ্ছিলো। ডাকলোনা তাকে। যাবার সময় কান্নাকাটি তার চোখের জল এরাতে চাইলো চার্লি। মাথার কাছে লিখে রাখলো চিঠি—'আমেরিকা চল্লাম। গিয়ে চিঠি দেবো ভালবাসা জেনো। চার্লি।'

॥ ষোল ॥

গরুমোষ বহনকারী এক জাহাজে পাড়ি জমালো চার্লি। বারো দিন কাটলো সমুদ্রে। আবহাওয়া ছিলো খুবই দুর্যোগ পূর্ণ। জাহাজ চললো কুইবেকের দিকে। চার্লির মনে কিন্তু দারুণ প্রফুল্লতা। বেশ আনন্দেই জাহাজে কাটালো সে। তবে জাহাজে খুব ইঁদুরের উপদ্রব। বড় বড় ধেড়ে ইঁদুর পায়ের উপর উঠে পড়তে চাইতো। জুতোর ঠোক্কর মেরে ইঁদুর তাড়াতো চার্লি। ক্যানাডা পেরিয়ে গেলো জাহাজ। সেপ্টেম্বরের শুরুতে পেরিয়ে গোলো নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড। চতুর্দিকে ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া। কিছুই চোখে পড়ছিলোনা। ঝিরিঝিরি ইলসেগুঁড়ি বৃষ্টিতে সেণ্ট লরেন্স নদীর ধু-ধূ নির্জন তীরভূমি। কুইবেকের সাগরতটে সোনালী বালির ঢিপি দেখে চার্লি ভাবতে বসতো, 'হ্যামলেটের প্রেতাত্মারা কি এখানেই ঘুরে বেড়ায়?' চার্লির কাছে কেমন যেন বিস্ময়কর ঠেকলো আমেরিকা। টরেণ্টো থেকে ট্রেনে চাপলো চার্লি। পরে নিউইয়র্ক। তখন শরতের রোদ—ঝলমল মনোরম সৌন্দর্যের মুগ্ধকর সাজে প্রসাধিতা যেন টরেণ্টো। চার্লির দেখে দেখে আর আশ মেটেনা। চোখ জুড়িয়ে আসে।

সকাল দশটাতে চার্লি পৌঁছালো তার স্বপ্নের নিউইয়র্কে। দিনটা ছিলো রবিবার। স্টেশন থেকে গাড়িতে করে এলো টাইমস স্কোয়ারে। যেদিকে দুচোখ যায় শুধু কাগজ আর কাগজ। খবরের কাগজ যেন ঢেকে রেখেছে চতুর্দিক। ফুটপাথে জুতোপালিশ ওয়ালাদের হাতের আর ফুরসত নেই যেন। তবে রাস্তাঘাটে ভীষণ নোংরা আবর্জনা আর ছেঁড়া কাগজে বোঝাই। সুধু চার্লির চোখে পড়ে লোকজনের অবিশ্বাস্য ব্যস্ততার হুড়োহুড়ি আর দৌড়োদৌড়ি। কারুর যেন সময় নেই হাতে। কেউ কিছু খাচ্ছে তাও তড়িঘড়ি করে। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে। বসার মত সময় ও যেন নেই হাতে কারুর। এখানে যেন শুধু কাজ আর কাজ। অথচ চার্লির মনে হলো প্যারিস ছিলো যেন কত আন্তরিকতায় ভরা। বন্ধুর মত। ছিমছাম সুন্দর তকতকে সাজানো। দরাজ দিলখোলা সব মানুষ। তাদের প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা দমফাটানো হাসির ঝঙ্কার মানুষকে নিমেষে কাছে টানে। খাবার দাবারের দোকানগুলোকে দেখে চার্লির মনে হলো যেন ডেটল জলে ধোয়া হাসপাতাল। যান্ত্রিক ভাবে যেন বেয়ারারা কাজ করে চলেছে।

ন্যুইয়র্কের পথের নাম সংখ্যা মিলিয়ে দেওয়া। চার্লি—একখানা ঘর ভাড়া করেছে ৪৩, নম্বর রাস্তাতে। এ রাস্তাতেই বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকার বিরাট বড় পুরনো বাড়িটা। চার্লির ঘরের নীচেই জামা কাপড় কাচার এক লণ্ড্রী। ধোপাখানার কাপড় কাচার রসায়নের গন্ধে চার্লির বিশ্রামের দফা রফা হবার যোগাড়। রেস্তোরাঁতে খেতে গিয়ে চার্লির খুব অসুবিধে হয়। চার্লির ইংরেজী এখানকার লোকেরা কিছুই বোঝে না। ডিম চাইলে ভ্যানিলা এনে দেয়।

এখানে ব্রডওয়েতে খুব নামকরা অভিনেতা আর রঙ্গালয়ের মালিকেরা থাকে। চার্লিদের এখানে ছ'সপ্তাহের মোটে চুক্তি। পার্সি উইলিয়ামসের সঙ্গে এই চুক্তি! উইলিয়ামসের যতগুলো রঙ্গমঞ্চ আছে তাতেই ঘুরে ফিরে অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে। শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের যদি নাটক মনে ধরে তবেই বায়না হবে নতুন করে। যদি বায়না না হয় তাহলে আমেরিকার পাট চুকিয়ে দেশে ফিরতে হবে সবাইকে। ফ্রেড কার্ণোর দলের সুনাম ছড়িয়েছে ন্যুইয়র্কেও। খবরের কাগজে বড় বড় করে 'আউ অব্রি' নাটকের অভিনয় সংবাদ ছাপা হলো। চার্লির মনে দারুণ দুশ্চিন্তা। যদিও আমেরিকার ঘটনা নিয়ে নাটকটা তবুও বলা তো যায় না, নাটকটা যদি দর্শকের মনে না ধরে। নাটক প্রথমদিকে একেবারেই জমল না। যদিও হাসির নাটক কেউ হাসত না। সার সার নিষ্প্রাণ মুখ। যেন থম মেরে বসে থাকত। ইংলণ্ডের দলের অভিনয় দেখতে এসে

সবাই ছ'সপ্তাহ ধরে যেন গম্ভীর মুখেই বাড়ি ফিরে যেত নাটক শেষে।

চার্লির মনের সব আশা যেন ফ্যাকাসে নিভে যাচ্ছিল নাটকটা দর্শকের ভাল না লাগাতে। দিনের বেলা চার্লি একা একাই পথে পথে ঘোরে। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, খেলার মাঠ—যখন যেখানে ইচ্ছে ঢুকে পড়ে। কখনও বা মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে চওড়া রাজপথের ধারে বেঞ্চিতে বসেই পড়ে। ফিফ্‌থ এভিনিউয়ের বিশাল উঁচুনীচু বাড়িগুলোকে অবাক চোখে দেখে। হাঁটতে হাঁটতে চার্লি কখনও ঢুকে পড়ত বস্তিতে। ক্ষুধা, দারিদ্র্যে ক্লান্ত শ্রান্ত গরীব লোকগুলোর বিষাদের উল্কি আঁকা মুখগুলোকে দেখে চার্লির মনে পড়ত পুরনো সেইসব দিনগুলোর কথা। ঝগড়া বিবাদ, মারপিট, ঝামেলা গালাগাল আর প্রকট দারিদ্র্যে পশুর মত দিনকাটানোর কথা মনে পড়ে যেত। নাটক একদমই মার খেল। চার্লি মন খারাপ। ভাল করতে কিনে ফেলল বেশ কিছু বই, ইংরেজী ব্যাকরণ, ছন্দ শেখার গোড়ার কথা, ল্যাটিন থেকে ইংরেজী ভাষার অভিধান—এসব বই কদিন খুব নাড়াচাড়া করল। কিন্তু ভীষণ কঠিন ঠেকল এসব চার্লির কাছে। ঘাবড়ে গিয়ে সমস্ত বই ঢুকিয়ে ফেলল বাক্সের তলাতে। অনেকদিন আর সেসব বই নাড়াচাড়া করা হলো না। চার্লিও বেমালুম ভুলে গেল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে অ্যামেরিকা আসার সময় বাক্সের ওজন বড্ড ভারি হওয়াতে পরীক্ষা করতে গিয়ে তলা থেকে বইগুলো বেরিয়ে পড়ল।

নাটক যতই খারাপ হোক ফলাও করে কাগজে সমালোচনা বেরোল। সমালোচকরা নাটকের তুলোধনা করে ছাড়ল। একমাত্র প্রশংসা পেল চার্লি। ভ্যারাইটি কাগজের তুঁদে সমালোচক সিম সিলভারম্যান চার্লি সম্পর্কে লিখলেন "ফ্রেড কার্ণোর দলের মধ্যে যথার্থ কৌতুকাভিনেতা বলতে মাত্র একজনই আছে। তার নাম চ্যাপলিন। মনে হয় আমেরিকা তাকে নিরাশ করবে না।" যাই

হোক নাটক চলার তৃতীয় সপ্তাহে ফিফ্থ এভিনিউতে নাটক যখন মঞ্চস্থ হচ্ছিল তখন দর্শকেরা হাসির দমকে যেন ফেটে পড়ল। দর্শক ছিল বেশীর ভাগই ইংরেজ। বেশ দাপটের সঙ্গে খুশী মনে সেদিন চার্লিরা সবাই অভিনয় করল। নতুন বায়না হলো টানা কুড়ি সপ্তাহের জন্য। আমেরিকার পশ্চিমে সালিভান আর কন্সিডালনের ছিল অনেকগুলো রঙ্গমঞ্চ। ঘুরে ঘুরে প্রতিটি রঙ্গমঞ্চে চার্লিদের অভিনয় করতে হবে। চার্লি বেশ আনন্দেই আছে। মিডলওয়েস্ট জায়গাটা চার্লির খুবই পছন্দ হলো। থাকা খাওয়া ওখানে খুবই সস্তা। মাত্র সাত ডলারের বিনিময়ে এক সপ্তাহ হোটেলে থাকা চলে। সঙ্গে মেলে তিন প্রস্থ ভাল খাবার দাবার। শূওরের মাংস, আলুর স্যালাড, সাটিন মাছ, ম্যাকারনি চালের সরু ভাত, ঠাণ্ডা পানীয় দেখ যে যত খেতে পারে। চার্লিদের দলের সবাই এক একজন রাক্ষসের মত খেতে শুরু করল। দোকানদারের মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়। বিদ্রূপ করে বলেও ফেলে "কোথাকার গেঁয়ো চাষা রে বাবা, পেটের মধ্যে কি জালা পুরে রেখেছে নাকি?" চার্লিদের দলে ছিল মোট পনেরো জন। নগদ পয়সা দিয়ে কেউ আর কিছু কেনে না। তাই সপ্তাহ না যেতেই প্রত্যেকের মাইনের অর্দ্ধেকের বেশী ব্যাঙ্কের খাতায় জমে গেছে। চার্লির তখন মাইনে সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার। দু'হাতে উড়িয়েই সে পঁচিশ ডলারের বেশী খরচ করতে পারে না। পঞ্চাশ ডলার করে জমা দিয়ে দেয় ম্যানহাটান ব্যাঙ্কে। অভিনয় চলাকালীন চার্লির আলাপ হলো টেক্সাসের একটা ছেলের সঙ্গে। সে ট্র্যাপিজের খেলা দেখায়। ভাল বক্সিংও জানে। রোজ সকালে চার্লি আর সেই ছেলেটা হাতে দস্তানা পড়ে মুষ্টিযুদ্ধ অভ্যাস করে। লম্বাচওড়া সেই সেই ছেলেটাই বেশী মার খায়। মস্ক করার শেষে সেই ছেলেটা চার্লিকে রেস্তোরায় নিয়ে গিয়ে প্রাণ ভরে খাওয়ায় আর গল্প শোনায়। নানারকম কথা হয়। একটা ব্যাপারে চার্লির সঙ্গে ছেলেটার খুবই মিল। দুজনেই যেন বেঁচে যায় অভিনয় ছেড়ে দিতে পারলেই, ঠিক

হলে অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার পর দুজনে নিকে ব্যবসা করবে। দুজনেই হবে সমান অংশীদার। সমান মূলধন, সমান লাভ। অনেক মাথা খাটিয়ে ঠিক হলো ওরা দুজনে শূয়রের ব্যবসা করবে। শূয়র পালবে। দুজনে মিলে দুহাজার ডলারের মত ব্যবসায় খাটাবে। ছেলেটাই খবর দিল আকান্সাসে নাকি শঞ্চাশ সেণ্টে এক একর জমি পাওয়া যায়। ঠিক হলো দু হাজার একর জমি কেনা হবে। তাতে খরচ হবে এক হাজার ডলার। বাকী টাকায় শূয়র কেনা আর জমি ভরাট করা হবে। হিসেবপত্তর করে দেখা গেল এক একটা শূয়র দেবে পাঁচটা করে বাচ্চা। পাঁচ বছরে বেড়ে উঠে সে হবে এক বিশাল শূয়র সাম্রাজ্য। মোট লাভের দুভাগ করলে চার্লির ভাগে পড়বে এক লাখ ডলার আর সেই ছেলেটার ভাগ্যেও তাই। বেশ কয়েকদিন ট্রেনে করে যাওয়ার সময় গাছপালা, বাড়িঘর, লোকজন সব কিছু এড়িয়ে চার্লির চোখ আটকে যেত শূয়রে খোঁয়াড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই আশায় আর উল্লাসে অংক কষে যেত কত দ্রুত শূয়োরের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। চার্লির পৃথিবীতে স্বপ্নে, জাগরণে, নিদ্রায় ধ্যানজ্ঞান ভাবনা তখন একটাই—শূয়র……শূয়র। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শূয়োরের প্রতিপালনের জন্যে চার্লি একখানা দামী বইও। কিনে ফেলল। কিন্তু বই পড়তে পড়তেই তার সব আশার মুখে কে যেন ছাই ঢেলে দিতে লাগল। ওরে বাবা এত হেপা এত ঝঞ্ঝাট শূয়র পালতে। আস্তে আস্তে চার্লির উদ্যম উবে যেতে লাগল। এক সময় শূয়র শব্দটাই বেমালুম ভুলে গেল সে।

চার্লির মাথায় ভূত চাপল বেহালার ঢোল বাজিয়ে মস্ত বড় শিল্পী হয়ে উঠতে হবে তাকে। দিনরাত নিয়ম করে চার থেকে ছ' ঘণ্টা হাত মক্স করে। কিন্তু একদিন হঠাৎ-ই বাজনায় ইস্তফা পড়ল।

চার্লিদের দল অভিনয় করে চলেছে পশ্চিমের উইনিপেতো টাকামো, সিটোল, ভ্যাঙ্কুভার শহরে। এখানকার বেশীর ভাগ দর্শকই ইংরেজ। ইংরেজ দর্শকদের চার্লিরা খুব সহজেই মুগ্ধ করে দিক।

ততদিনে চার্লিও অ্যামেরিকান অভিনয় কায়দা ভাল করে রপ্ত করে ফেলেছে। ক্যালিফোনিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চার্লিকে মুগ্ধ করে ফেলল। সানফ্রান্সিসকোতে চার্লি প্রথম ব্যাংয়ের মাংস খেতে শিখল। ওখানকার জাম আর নাসপতি দিয়ে তৈরী চমৎকার স্বাদের কেক চার্লির খুব মনে ধরল।

ওখানে ক্রমপ্রেস থিয়েটার হলে 'আউ আউ' নাটকে চার্লির খুব নাম হলো। হলের মালিক সিড গ্রাউম্যান মস্ত বড় পোস্টার লটকে দিল হলের বাইরে। তাতে কার্নোর নাম নেই। শুধু মাত্র চার্লির ছবি আর চার্লিরই নাম লেখা। নাটক কিন্তু সেই 'আউ আউ'। কিন্তু তবুও লোকে লোকারণ্য। অনেক লোককে ফিরে যেতে হলো টিকিট না পেয়ে। লোকেরা নাটক দেখে হেসে বাঁচে না। গ্রাউম্যান চার্লিকে অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল চার্লি যেন ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করে। কার্ণো যদি কোনও-রকম বেচাল করে তবে যেন চার্লি নির্দ্বিধায় গ্রাউম্যানেয় কাছে চলে আসে। দরকার হলে সে চার্লির একক প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। চার্লি খুবই উৎসাহ পেল এতে ভবিষ্যতে আশার বুনিয়াদ শক্ত হলো তার। লস এঞ্জেলসে অভিনয় করতে এসে চার্লির আদৌ ভাল লাগল না। নোংরা, ধুলো ধোঁয়া আর গরমে যেন হাঁপিয়ে উঠল চার্লি। তবে দর্শকরা খুবই ভাল। যেমন ধার্মিক, সাত্ত্বিক তেমনি বিনয়।

ন্যুইয়র্কে ফেরার পর আবার ছ'সপ্তাহের জন্য বায়না করল উইলিয়াম মরিস। দেশে ফেরা হলো না। ফ্রেড কার্ণোর দলের সব কটি নাটকই পরপর অভিনয় করে যেতে হবে। খোদ ন্যুইয়র্ক শহরেই মরিসের অনেকগুলো রঙ্গমঞ্চ ছিল। চার্লি নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে মন প্রাণ ঢেলে দিল অভিনয়ে। 'A night in an English Music Hall' নাটক দিয়েই শুরু হলো অভিনয়। প্রথম দিনই কেল্লা ফতে। দর্শক মুগ্ধ হলো জমজমাট অভিনয়ে। ঐ নাটকে মাতালের ভূমিকায় চার্লির অসামান্য অভিনয় দর্শকদের।

অভিভূত করেছিল। ম্যাক সেনেট যিনি ছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ডি. ডাবলিউ. গ্রিফিথের সহকারী—সপ্তাহে পাঁচ ডলার মাইনে ছিল যাঁর সিনেমার ছোটখাটো ভূমিকায় কাজ করতে হত যাঁকে, পরে যিনি নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলেছিলেন কিস্টোন কম্পানি—সেই সেনেট নাকি তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে নিছকই সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে টিকিট কেটে ঢুকে পড়েছিল চার্লিদের নাটক। পুরো নাটকে দেখার ইচ্ছে বা সময় কোনটাই তাঁর ছিল না। অথচ মজার ব্যাপার হলো সময় যে কোথা দিয়ে কখন পার হয়ে গেল টেরও পেলেন না তিনি। হল থেকে বেরোতে বেরোতে তিনি তাঁর বন্ধুকে বলছিলেন—যদি কখনও সিনেমা লাইনে কেউকেটা হই তবে ঐ মাতালটাকে আমার কাজে জবরদস্ত লাগিয়ে নেব। ওকে আমার কাজে লাগবে। জমজমাটি অভিনয় শেষে মরিসের ছ'সপ্তাহের চুক্তিও কেটে গেল। ফিন আবার নতুন বায়না এলো সুলিভান এবং কনসিডাইন সারকিটের তরফ থেকে। মোট কুড়ি সপ্তাহের চুক্তিতে পশ্চিমে অভিনয় করতে যেতে হবে চার্লির দলকে। দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে গেল। সানফ্রান্সিসকো। সানদিয়াগো আর সল্ট লেক অভিনয় পরিক্রমার অবসান হলো।

সানফ্রান্সিসকো থেকে চলে আসার সময় বাজারের ভিড়ের রাস্তাতে একটি ছোট্ট দোকানের সাইনবোর্ড চার্লির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—"এখানে ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। হাতে অথবা তাসে। দক্ষিণা মাত্র এক ডলার। পরীক্ষা প্রার্থনীয়!" চার্লি কেন যেন পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঘরের ভেতরে বছর চল্লিশেক বয়সের একজন মহিলা কিছু একটা খাচ্ছিলেন। চার্লিকে দেখে আঙ্গুল দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। মহিলা চার্লিকে বসতে বলেই হাতে এক প্যাকেট তাস তুলে নিল। তাসের প্যাকেট খুলে চার্লির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন সে যেন তাসটা ভেঁজে দেয়। চার্লি তাই করল। তখন সেই মহিলা বললেন চার্লি যেন তাসগুলোকে

তিনভাগ করে সাজিয়ে রাখে। তাই করল চার্লি। সেই মহিলাটি তাসগুলো উল্টে ছড়িয়ে নিয়ে কি যেন দেখলেন। এর পরে মহিলা চার্লির দুহাতের চেটো খুব মনযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। চার্লিকে জানালেন—কোথায়ও যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। তার মানে অ্যামেরিকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু চলে যাওয়া মানেই পুরোপুরি চলে যাওয়া নয়। আবার ফিরে আসতে হবে এখানেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, নতুন এক কাজ নিয়ে। এখন যা করা হয় সেটা নয়, নতুন কোনও কাজ। নতুন কাজ বর্তমান কালে চলা, কাজের থেকে খুব একটা পৃথক গোছের হবে না, অনেকটা এরকমই। জীবনে প্রচুর সম্মান পাবেন। সফলতার চূড়ান্তে পৌঁছাবেন। টাকার পাহাড় জমে যাবে। বিয়ে তিনটে। প্রথম দুটো সুখের হবে না, টিকবেও না, তৃতীয়টি টিকে যাবে। সন্তান মোট তিনটি যদিও এটা একেবারেই মেলে নি। মৃত্যু বুকে সর্দি বসে নিউমোনিয়ায়। আয়ু প্রায় বিরাশিবছর। তার পারিশ্রমিক এক ডলার। আর অন্যান্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এক ডলার দিয়ে চার্লি কোনও কথা না বলে বেরিয়ে এলেন।

ইতিমধ্যে সল্ট লেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কাগজে কাগজে ফলাও করে বেরোয় চুরি, রাহাজানি আর ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর। বুকের কাছে পিস্তল উঠিয়ে যার যা আছে সব কেড়ে নেয় ডাকাতের দল। সারা শহর জুড়ে চলছে দারুন এক আতংকের ঢেউ।

এতে অবশ্য চার্লিদের অভিনয় দলের বিশেষ কিছু এসে যায় না। কেউই তো আর বিরাট কিছু ধনসম্পদের মালিক নয়। থিয়েটার শেষে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে চলে আনন্দ উল্লাস আর হৈ চৈ—এর পালা। অনেকে এসে যেচে খাতির জমায়, লোকগুলোকে মন্দ লাগে না। এভাবেই কেটে যাবে সাত সাতটা দিন।

একদিন চার্লিরা সবাই খেতে বসেছে এমন সময় তিনজন আগন্তুক

এসে তাদেরই পাশের টেবিলে বসল এবং ওদের মধ্যে মোটা মত একজন বিশেষ করে চার্লিকেই লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ-ই উঠে এসে প্রশ্ন করে বসল—চার্লিরাই এসপ্রেস হলে নাটকের অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে কিনা। চার্লি সম্মতি জানালে লোকটি তার অন্যান্য সাথীদের সাথীদের দিকে তাকিয়ে বলল যে সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। এই দলটিই নাটকের অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে এই লোকটি ইংরেজ যদিও বহুদিন দেশছাড়ায় ওর কথাবার্তার ঢং পুরোপুরি বদলে গেছে। কথায় কথায় রাত বেড়ে চলল। ওর আর দুই সঙ্গী বিদায় নিয়েছে ইতিমধ্যেই। ওর বকবকনি আর থামে না। আমিও আটকে পড়ে গেছি। নানা কথাবার্তার ফাঁকে বেরিয়ে বাড়লো তার পেশার কথা। চাকরী করতে এসেছিল পেটের তাগিদেই কিন্তু চাকরী তার পোষাল না। এখন তার ফলাও ব্যবসা। তার আর দুই সাকরেদ ভীষণ সাহসী যদিও নাকি একেবারেই মাথামোটা। তবে এদের সাহায্যেই সে চালিয়ে যাচ্ছে তার চুরি ডাকাতি ছিনতাই এর ব্যবসা আর লুটে নিচ্ছে দুহাত ভরে শধু টাকা আর টাকা! গোলামী করে তার কি পোষায়? ওর কথা শুনে চার্লির তো ভয়ে চোখ ছানাবড়া। সর্বনাশ এসে কাছের পাল্লায় পড়ল? মনের কথা হয়ত কিছুটা আন্দাজ করেই সে বলে উঠল ভয় নেই, দেশের লোক তাই ঘেচে একটু আলাপ করে নির্লাম। আপনার অভিনয় দেখে থেকে আলাপ করার জন্য দিন গণছিলাম। খুব যাহোক ঝামেলার কাজ আপনাদের। আমাদেরটা তার থেকে অনেক কম ঝক্কির।" এই বলে সে উঠে করমর্দন করে বিদায় নিল। সেই শেষ আর তার সাক্ষাৎ জীবনেও পায় নি চার্লি।

॥ সতেরো ॥

অনেকদিন পর এবার এলো ঘরে ফেরার পালা। খুশী মনেই চার্লি ফিরছে লণ্ডনে। দুঃখ কিসের! মুইয়র্ক সফর আবার হবেই হবে—এসম্বন্ধে চার্লির মনে এতটুকু দ্বিধা নেই। এখন শুধু শান্তির পীঠস্থান লণ্ডনের উষ্ণতার ছোঁয়ার অপেক্ষা।

সিডনী অনেকদিন চিঠিপত্র দেয় নি। অনেকদিন আগে সে তার শেষ চিঠিতে জানিয়েছিল যে তাদের দাদামশাই তাদের কাছেই এখন থাকেন। মন্দ কি! ঘরও তো কম নয়—চারখানা না হয় তাঁর ব্যবহারের জন্যই ছেড়ে দেওয়া হলো। এখন তো আর কোনও অসুবিধে নেই। এইসব নানা ভাবনায় মশগুল হয়ে ট্রেনে চড়ে লণ্ডনে ফিরছে চার্লি। স্টেশনে নেমেই দেখেন সিড্নী তার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে। দুই ভাইএর সে কি উল্লাস! অনেক অনেকদিন পর আবার দেখা হলো। দুজনের বুকেই না বলা কথা পাহাড় প্রমাণ জমে রয়েছে। এরই মধ্যে সিড্নী দু দুটো গুরুত্বপূর্ণ খবর শুনিয়ে দিল। চার্লিদের পুরনো ফ্ল্যাট সে ছেড়ে দিয়েছে আর বিয়ে করে নতুন বৌ নিয়ে ব্রিক্সটন রোডে নতুন একটা ফ্ল্যাট নিয়ে সে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে।

কথাটা শুনে একটা বেজায় চমক খেল চার্লি। সেই সুন্দর সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটটা চোখের সামনে ভেসে উঠল তার। এখন তাহলে তার জায়গা হবে কোথায়? এক মহূর্তেই তার কাছে ইংল্যাণ্ডের টান উবে গেল। মন চায় ফিরে যেতে এক্ষুণি আবার। সে যাই হোক থাকতে তো হবে। ব্রিক্সটন রোডেরই পশ্চিমে একটা ঘর পাওয়া গেল। দুভাইকে তো কাছাকাছি পাওয়া পর। যদিও আগের মত সিড্নীকে নিজের করে বেশীক্ষণ কাছে পায় না চার্লি। নিজের কাজে সিড্নী বড় ব্যস্ত। সপ্তাহে একদিন মাত্র রবিবারে

ছুটি পায়। দুজনে মিলে তাদের মাকে দেখতে যায়। মায়ের অসুখ কমে নি। এসব দেখেশুনে চার্লির আর ভাল লাগে না। মায়ের ছুটফটানি কমাতে নাকি তাকে ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছে। চার্লির কাছে এ দৃশ্য অসহ্য। তাই সিড্নীই গেল মাকে দেখতে। ফিরে এসে জানাল মাকে নাকি ঠাণ্ডা বরফ জলে চান করানো হয়েছে; সে ধকল মা নাকি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মুখখানা নীল হয়ে গেছে। এসব শুনে চার্লির মনে হলো হাসপাতালে মায়ের ঠিকমত সেবা যত্ন হচ্ছে না। নার্সিং হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হল তাঁকে। খরচের জন্য তার তো আর চিন্তা নেই। দুভায়ের এখন প্রচুর আয় উপার্জন। মাকে যে নার্সিং হোমে রাখা হলো সেখানে একসময় ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন একজন কৌতুকাভিনেতাকেও রাখা হয়েছিল। তিনি যদিও এখন আর বেঁচে নেই। মা ও আর কোন দিনই সেরে ওঠেন নি।

লণ্ডনের স্বাদ চার্লির কাছে ইতিমধ্যেই বড্ড তেতো হয়ে গেছে। মনে হয় জন্মভূমি তাকে আর কাছে পেতে চায় না। হয়তো আগের সেই সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটটি থাকলে এমনটি মনে হত না। সারাদিন মনমরা হয়ে তার দিন কাটে। একা একাই সে বিষণ্ণ মনে ঘুরে বেড়ান. এককালে অতি পরিচিত স্বদেশের সবকিছুই যেন তার কাছে একেবারেই অপরিচিত হয়ে গেছে। অ্যামেরিকা থেকে ফিরে এসে সর্বদাই কেমন একটা শূন্যতা বোধ তাকে ঘিরে রেখেছে। লণ্ডনে এখন মনোরম গ্রীষ্মকাল। একসময় কত ভাল লেগেছে এই আবহাওয়া। কিন্তু প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হওয়ার মত আগের মন তার আর নেই।

এভাবেই কাটছিল দিন। হঠাৎ-ই এলো একদিন কার্নোর আমন্ত্রণ বিরাট বড় একটা শাম্পান কিনে ফিলেছেন তিনি। মস্ত এক বজরা মত, তাতে করে তারা সদলে যাবে ট্যাগস্ দ্বীপে। সেখানকার পরিবেশ খুব শান্ত আর নীরব। ছুটি কাটানোর মজা উপভোগ করবে

সবাই। তিনি জানতে চেয়েছেন চার্লি যেতে সম্মত আছে কিনা। চার্লি তো একপায়ে খাড়া। মনের মধ্যে তার সদাই উড়ুউড়ু ভাব এখন। কদিন আনন্দে কাটবে ভেবে তার মন নেচে উঠল।

শাম্পানটা দেখতে খুব সুন্দর! মেহগনী কাঠ দিয়ে তৈরী। তাতে অনেকগুলো ঘরও আছে। রাত্রে আলোরও ব্যবস্থা আছে। অনেক রঙ্গীন নিশান উড়িয়ে শাম্পান ভেসে চলল। আবহাওয়াটাও খুবই মনোরম। খাওয়ার আয়োজনও প্রচুর। রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে সিগারেট হাতে কফির কাপ হাতে ডেক চেয়ারে বসে চার্লি ভাবতে লাগল ইংল্যাণ্ড যদি সারা জীবন্ তাকে এরকম সুখের সাগরে ভাসিয়ে রাখতে পারে তবে এ দেশকে কখনই ভুলতে পারবো না। সে। একদিন এভাবেই বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ-ই অন্ধকারের মধ্যে ভেসে এলো একটা গানের সুর গানটার কথা খুবই আমোদ আহ্লাদ জনক। কি জানি কার আবার এখন এত রাতে গান গাইবার সখ হলে কে জানে! ভালো করে চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে চার্লির চোখে পড়ল, ঠিক তাদের শাম্পানটার পেছনে আর একটা নৌকো। তাতে আয়েস করে বসে রয়েছেন একজন ভদ্রলোক তার পাশে বসা এক মহিলা মৃদুমৃদু হাসছেন। আর সেই মানুষটি পাগলের মত উর্দ্ধবাহু হয়ে শরীর দুলিয়ে গান গাইছে আর খুব হাসছে। দৃশ্যটা বেশ মজার। তাদের একটু পিছনে লাগতে ইচ্ছে করল। কার্নো তাঁর পুরনো ভঙ্গীতে নাকে হাত দিয়ে শুরু করলেন বিকট স্বরে ভোঁ বাজানো। কিন্তু তারা তাতেও ভ্রূক্ষেপ না করায় চার্লি শুরু করল খিস্তি খেউর। গালা গাল শুনলে কানে হাত দিতে হয়। অবিশ্রাম বকে চলল চার্লি। ভদ্রমহিলা তা শুনে হাসি চেপে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। গানটান তখন থেমে গেছে। তাড়াতাড়ি বৈঠা তুলে নিয়ে মহিলাটি জোরে জোরে টানতে শুরু করলেন নৌকো। মূহূর্তের মধ্যে তারা চোখের আড়াল হয়ে গেল।

লোকটা বোধ হয় বেজায় বোকা। তা না হলে মাঝরাতে কেউ

অমন পাগলের মত গান গায় নাকি! সবে ত্নটো কাঁচা পয়সা করেছে, বোধহয়। এরকম হঠাৎ ধনী এখন ইংল্যাণ্ডের পথেঘাটে বহু ছড়িয়ে আছে। পয়সার এদের ভারি গরম। কিন্তু এতই যদি পয়সা, যাক্ না দেখি, গিয়ে বলুক তো বাকিংহাম প্রাসাদটার মালিক হবারও ক্ষমতা আছে তাদের। যত্তো সব আজে বাজে আহম্মকের দল। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে যায় চার্লির।

বেরিয়ে এসেই সবাইকে নামতে হলো আবার কাজে। গোটা দলটাই এক সাথে কাজ করবে। ঘুরে ঘুরে লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গায় চোদ্দ সপ্তাহের কাজ হলো। চার্লির যশ এখন উত্তুঙ্গে; সাফল্য তার করায়ত্ত। কিন্তু তারও তার ভাল লাগে না। বারবারই মনে পড়ে বিগত আমেরিকা সফরের কথা। সেখান থেকে ডাক আসার অপেক্ষায় সে পথ চেয়ে থাকে। দেশের প্রতি আগের মত টান তখন আর অনুভব করে না চার্লি।

ত্নভাই মিলে আবার একদিন যাওয়া হলো মাকে দেখতে। আগের চেয়ে এখন তিনি একটু ভালো। সিডনী আবার কদিন পরেই বেরিয়ে পড়বে দলবল নিয়ে। ত্নজনে মিলে একসঙ্গে বসে অনেকদিন বাদে একদিন নৈশ ভোজন সারলেন। পরদিনই এসে গেল চার্লির আবার আমেরিকা যাওয়ার ডাক। উল্লাসে ফেটে পড়ল সে। ওয়েস্ট এণ্ডের সেই পুরনো ফ্ল্যাটটার রাস্তা ধরে কত হাঁটল সে। কিন্তু সে তখন জানতোনা। এই শেষ, আর এ পথে আসা কোনদিনই তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

॥ আঠারো ॥

এবার ধরা হয়েছে অলিম্পিক নামের সেই ট্রেনটা। যেটা ন্যুইয়র্ক হয়ে যায়। ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে চলেছে চার্লিরা। এবার কিন্তু আর বিদেশ যাচ্ছে বলে মনে হল না চার্লির। নির্দিষ্ট স্টেশনে এসে সদর্পে নামলো চার্লি। আমেরিকাকে এখন লণ্ডনের চাইতে অনেক বেশী আপন বলে মনে হল চার্লির।

ন্যুইয়র্ক মন্দ লাগেনি চার্লির। কিন্তু পশ্চিমের ঝোঁকটাই তার বেশী। আগের বার এসে সেখানে অনেকের সঙ্গেই বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল সে। তাদের সকলের কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়। কিন্তু পশ্চিমে রওনা দেওয়ার আগে শিকাগো এবং ফিলাডেলফিয়ার ছোটখাটো মঞ্চগুলোতে মঞ্চস্থ হলো চার্লিদের নাটক।

চার্লি একাই থাকে। একা থাকতেই তার আনন্দ। এভাবে থাকলে মানসিক দিক থেকেও তার বেশ দৃঢ়তা আসে। কিন্তু বাস্তবে নিজেকে উন্নত করার সংকল্প কিছুতেই যেন হয়ে ওঠে না তার।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে অন্তরের সঙ্গে-কেউই গ্রহণ করতে পারে না মনে হয় চার্লির। অন্যের কাছে বাহাদুরি পাওয়ার লোভে লোকে শিক্ষিত হতে চায়। তাই তারা অশিক্ষিত লোকদের ঘেন্না করে। কোনও ক্রমে একবার যদি কাউকে তারা মূর্খ বলে জেনে যায় তবে তাকে তারা ভীষণ ঘেন্না করে, অবহেলা করে। কিন্তু এসব অবহেলা উপেক্ষার উর্দ্ধে ওঠার জন্যই চার্লির জানার সংকল্প এত তীব্র।

সুযোগ সুবিধেমত চার্লি ঢুকে পড়ে পুরনো বইয়ের দোকানে। 'এসেজ এণ্ড লেকচারস্' নামে রবার্ট ইঙ্গারসলের লেখা একটা বই কিনে ফেললে চার্লি। আগাগোড়া পড়ে চার্লির মনে হলো বইটি ঠিক যেন তার মনেরই প্রতিচ্ছবি। বাইবেলের যত্তোসব সংস্কারাচ্ছন্ন

অন্তঃসারশূন্য নিয়মাবলী মানুষকে ক্রমশঃই অধঃপতনের পথে নিয়ে যাচ্ছে! এভাবেই বেড়ে চলে তার আগ্রহ। এর পর কিনে ফেলল ইমারসনের লেখা আত্মনির্ভরশীলতার উপর লেখা সেই বইখানা। পড়ে মুগ্ধ হলো চার্লি। আবার কিনল সোপেনহাওয়ারের লেখা বিখ্যাত সেই গ্রন্থ 'ইচ্ছা এবং চিন্তাধীন তুনিয়া'। পড়ে পড়ে তার আর আশ মেটে না, কৌতুহল ক্রমশঃ যেন বেড়েই চলে। আবার চেনা হল ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'ঘাসের কলি।' পড়ে উপলব্ধি করল চার্লি দেশের প্রতি তার গভীর আন্তরিক ভালবাসার কথা। টোয়েনও শেষ হলো, তারপর এল পো। হথর্ণও শেষ হলো। আরভিং, হাৎলিট—নেশার আর শেষ নেই। যেখানেই যায় চার্লি বইয়ের বোঝা তার সঙ্গে যায়। সুযোগ পেলেই খুলে বসে বই। অনেক জানা হলো। চার্লির আর ঠকার সম্ভাবনা নেই। তাকে তো আর কেউ ছোট নজরে দেখতে পারবে না। এতেই চার্লি সন্তুষ্ট, বেশী জানার আর তার প্রয়োজন নেই।

নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়ে অভিনয়ের একই পুনরাবৃত্তি আর চার্লির ভাল লাগে না। পরিশ্রমও কম নয়। একই রাতে পরপর তিনটে করে শো চালাতে হয়। একটা দিনও ছুটি নেই। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু এর চেয়ে ভাল ছিল। প্রতিদিন তুটো করে শো, এছাড়া রবিবারেও ছুটি মিলত। অ্যামেরিকা তাদের ভীষণ খাটিয়ে মারছে দেখা যাচ্ছে। তবে এখানে আছে অফুরন্ত টাকা। এত টাকা লণ্ডনে বসে পাওয়া যেত না শত চেষ্টা করলেও। কিন্তু টাকা তো আর ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। ফিলাডেলফিয়ায় এসে মনে হলো চার্লির আর পারা যাচ্ছে না, কদিনের অন্ততঃ ছুটি তার চাইই চাই। সৌভাগ্য বলতে হবে, ছুটিও মিলল, সাতদিনের ছুটি। চার্লির ইচ্ছে করল কোথাও একটু বেড়াতে যেতে। এমন কোনও জায়গায় যেখানে কেউ তাকে একেবারেই চিনতে পারবে না। জমে যাওয়া পয়সা ওড়ানোর এই তো সুযোগ!

রাতারাতি চার্লি বানিয়ে ফেলল একটা ঝোলা কোট। কেনা হল মস্ত এক ঢাউস সুটকেস। সব কিনতে পঁচাত্তর ডলার খরচ হয়ে গেল। দোকানদার অতগুলো টাকা একসঙ্গে পেয়ে খুব খুশী। চার্লিকে জিজ্ঞেস করল মালগুলো তার ডেরায় পৌঁছে দেবে কিনা। শুধু বার বার স্যর, স্যর বলে সম্বোধন করায় চার্লির খুশী। পয়সা খরচ না করলে তো আর ঐ সম্মানটুকু তার ভাগ্যে জুটত না।

সোজা চলে গেল চার্লি ন্যুইয়র্ক। এ্যাস্টর হোটেলে গিয়ে উঠল। নামীদামী হিসাবে হোটেলটার তখন বেশ নাম। খরচের বহরও খুব, তাই চট করে কেউ আসে না। রেজিস্টারে নাম সই করার সময় চার্লিরও নিজের ঘেমে ওঠার জোগাড় আর কি! ঘরভাড়া প্রতিদিন সাড়ে চার ডলার শুনে চার্লির বুক ধক করে কেঁপে উঠল; সব টাকা এ মুহূর্তেই দিতে হবে না জেনে তবু একটু স্বস্তি পেল যাহোক্। আবার 'স্যর' বলে সম্বোধন করল হোটেলের লোকগুলো। চার্লি বেজায় খুশি আবার। হোটেলটা ভারি সুন্দর করে সাজানো গোছানো। ঘরে ঢুকে চার্লি ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। আরে ব্যস কি বড় স্নানঘরটা! গরম ঠাণ্ডা দুরকম জলেরই বন্দোবস্ত আছে এখানে। যা লাগবে সবই হাতের কাছে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে আরে বাবা, কথাতেই তো বলে ফেল কড়ি মাখো তেল।

স্নানের পোশাক পরে স্নান সেরে নিল চার্লি। যা কিছু লাগবে সব নতুন নতুন চার্লি কিনে এনেছে। বিলাস বৈভবের শেষ বিন্দুটিও যেন তার নাগালের বাইরে না চলে যায় এই ইচ্ছে আর কি। নতুন এক প্রস্থ পোশাক পরে চুলটুল আঁচড়ে চার্লির হঠাৎই খবরের কাগজের অভাব বোধ হতে লাগল। কিন্তু খবরের কাগজ আনতে হলে তো বেয়ারাকে ডেকে পাঠাতে হবে। সে এনে দেবে, তবে তার পড়া হবে। এ মুহূর্তেই পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে থাক্ না, খবরের কাগজ না পড়লে কি এমন ক্ষতি হয়ে যাবে তার! তার চেয়ে বরং তার সাড়ে চার ডলারের বিনিময়ে কেনা রাজপ্রাসাদের এই

ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছে হলো তার। কাগজ পড়ার চেয়ে তা কম সুখের হবে না কোনও অংশেই।

খাওয়ার ব্যবস্থা নীচে। খাবার ঘরে এসে চার্লি দেখল ঘর ফাঁকা। খাবার সময় এখনও হয় নি। বেয়ারা সসম্ভ্রমে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে চেয়ার এগিয়ে ধরে তাকে ঢোকার পথ করে দিল। চার্লির নিজেকে ভারি খুশী মনে হতে লাগল। বেয়ারাটা তাকে বসিয়ে দিয়ে বিনীত ভাবে পাশে দাঁড়িয়ে রইল। টেবিলগুলো সবই ফাঁকা। একমাত্র চার্লিই সেখানে প্রধান আকর্ষণ। আরও কয়েকজন বেয়ারা এগিয়ে এলো। মেনু কার্ড দেখে নানা রকম ভাল ভাল খাবারের অর্ডার দিল চার্লি। খাবার এলো কনসোম, রোস্ট চিকেন আর সবশেষে ভ্যানিলার স্বাদে ভরপুর অপূর্ব আইসক্রীম। আধ বোতল শ্যাম্পেনও এলো অবশ্য। খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল চার্লি। সবটা খেতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। পাতে কিছু কিছু অবশিষ্ট না থাকলে সবাই আবার হাঘরে ভেবে বসতে পারে। এক ডলার বখশিস বেয়ারাকে দিয়ে চার্লি উঠে এলো নিজের ঘরে। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

বাইরের আবহাওয়াও চার্লির মেজাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেশ গরম। মেট্রোপলিটান মঞ্চে তখন একটা অপেরা চলছে যাতে নাচ গানের ভাগটাই বেশি থাকে। চার্লি অপেরা কোনদিনও দেখেনি, তার একদম ভাল লাগে না বলেই আর কি। কিন্তু আজকে ঘরে থাকতে মন চাইছে না। তাই টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে পড়ল চার্লি। সীট পড়ল দ্বিতীয় সারিতে। তারপর আস্তে পর্দা উঠল। চার্লি না জানে অপেরার বিষয়বস্তু। না জানে ওদের ভাষা। কিন্তু নাটকের শুরুতে যখন নায়ক মৃত রানীকে পাঁজাকোলে করে তুলে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো করুণ সুরে একটি কোরাস গান। তখন চার্লি আর নিজেকে সামলাতে পারল না। শিশুর মত কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। আশেপাশের

সবাই তখন চার্লিকে অবাক চোখে দেখতে শুরু করেছে। নাটক শেষ হলো। কিন্তু চার্লির মনমরা ভাবটা গেল না। কান্নার দলাটা যেন এখনও তার গলায় আটকে আছে। কোনও দিকে দৃকপাত না করে চার্লি বেরিয়ে এলো হলের বাইরে। তাকে নিয়ে কে কি ভাবছে একথা তার ভাবার দরকার নেই।

বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট ছোট গলি ঘুঁজি ধরেই এগিয়ে চলল চার্লি। নিজেকে আর পাঁচজনের সামনে মেলে ধরতে তখন আর তার ভাল লাগছে না। বিছানায় গড়িয়ে পড়ল চার্লি।

হোটেলে ঢোকার পথে চার্লির মনে হল কে যেন তাকে ডাকছে। ঘুরে তাকিয়ে দেখে হেটির দাদা আর্থার। হেটিদের দলেরই ম্যানেজার ছিল সে আর সেই সূত্রেই চার্লির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। চার্লিকে এই হোটেলে দেখে সে তো অবাক। কিন্তু চার্লির দুঃখী দুঃখী ভাবটা তখনও কাটে নি। সামান্য কথা বলে শুতে যাওয়ার অজুহাতে চার্লি চাইল তাকে এড়িয়ে যেতে। কিন্তু আর্থার নাছোড়বান্দা। তার আরও দুই সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার ম্যাডিসন এ্যাভিনিউর ফ্ল্যাট বাড়ির ঠিকানা দিয়ে চার্লিকে পরদিন কফি খেয়ে আসার আমন্ত্রণজানালো।

পরদিন চার্লি গেল তাদের ফ্ল্যাটে। সাজানো গোছানো বেশ সুন্দর ফ্ল্যাটটা। আর্থার কিন্তু ভুলেও পুরনো কথার জের টানল না। হঠাৎ-ই প্রশ্ন করল অ্যাস্টরের মত অত নামী দামী হোটেলে চার্লি উঠতে গেল কেন। জবাবে চার্লি জানাল এমনি, সামনে যেটা পেয়েছে সেটাতেই উঠেছে। এই আর কি। সকল কথা ভেঙ্গে বলতে চার্লির ভারি বয়েই গেছে।

আর্থারের কাছে চার্লি শুনলো ওর ভগ্নীপতি ফ্র্যাঙ্ক জে. গোল্ড ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। তারা এক সঙ্গে ব্যবসা করছে একটা। তারপর শুরু হল তার ভগ্নীপতির প্রশংসা। এক নাগাড়ে বকর বকর করেই চলল। দূর চার্লির এসব বড্ড একঘেয়ে লাগছে। উপকার

না পেলে কেউ কারো প্রশংসা করে নাকি! বড্ড পালটে গেছে আর্থার। এত কথা বলছে অথচ নাটকের প্রসঙ্গে একেবারেই চুপ মেরে রইল। একটা কথাও তুলল না।

ন্যুইয়র্কে থাকতে আর ভাল লাগছে না চার্লির। তাই ভোর হতে না হতেই সোজা চলে এল ফিলাডেলফিয়ায়। চার্লি সব সময় এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতার ভোগে। চারপাশে কত লোকজন, অথচ সে বড় একা, সবই তার অচেনা অজানা আর অপরিচিত। হাঁপিয়ে ওঠে চার্লি দুদিনের মধ্যেই। অবশ্য কাজ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার কথা আবার সোমবার থেকেই। তাই ফিলাডেলফিয়ায় চার্লি অনেকটা আস্বস্ত বোধ করে।

॥ উনিশ ॥

নতুন পাতা থেকে হবে নিজের হোটেলে ফেরার আগে চার্লির মন থিয়েটার হলের দিকে টানতে লাগল। তাদের দলের ম্যানেজারও এখানেই থাকেন। একবার দেখা করে যাওয়ার ইচ্ছে হলো। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার। যেতে না যেতেই তিনি চার্লির হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা টেলিগ্রাম। অবশ্য টেলিগ্রামটা চার্লির কিনা সে বিষয়ে তিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নন তবুও তাঁর মনে হল ওটা চার্লিরই।

টেলিগ্রামটা বড় অদ্ভুত। ম্যানেজারকে সম্বোধন করে লেখা "দলে চ্যাফিন নামের যদি কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে তবে সে যেন কালাবিলম্ব না করে ২৪ নং সঙ্গের বিল্ডিংয়ে ক্যাসেল এণ্ড বোম্যানের অফিসে অবশ্যই গিয়ে দেখা করে।"

চার্লিই নিঃসন্দেহে চ্যাফিন। ভুলবশতঃ কেউ ঐ নাম লিখেছে। চার্লি তো রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। টেলিগ্রামটা পাঠাল কেন? তবে কি তার দূর সম্পর্কের সেই ঠাকুমার ভবলীলা সাঙ্গ হল নাকি? তাকে চার্লি কখনও দেখে নি। তার মার মুখে শোনা যে তিনি নাকি অ্যামেরিকাতেই থাকেন। চার্লির বাবার কোন এক দূর সম্পর্কের কাকার মা হলেন সেই ঠাকুমা। তবে কি চার্লিকে তিনি উইল করে তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিক করে দিয়ে গেলেন নাকি? যে বাড়িটার ঠিকানা ঐ টেলিগ্রামটায় দেওয়া আছে ঐ মস্ত বাড়িটা চার্লি তো অনেকবার দেখেছে। সারা বাড়িটা জুড়ে শুধু উকিল, মোক্তার আর এ্যাটর্নী অফিসের ছড়াছড়ি। চার্লি একটা টেলিগ্রামে ক্যাসেল এণ্ড বোম্যানের অফিসে জানাল যে দলে চ্যাফিন

নামে কেউ নেই। তবে চ্যাপলিন নামে আছে। যদি চ্যাপলিনকে তাদের প্রয়োজন থাকে তবে তারা যেন তা জানিয়ে দেয়। সেদিনেরই বিকেলে এল আরও একটা টেলিগ্রাম। খুলে দেখে চার্লি, তাতে লেখা রয়েছে "চ্যাপলিন যেন যত দ্রুত সম্ভব আমাদের অফিসে দেখা করে।"

ভোরের ট্রেনে পরদিনই চার্লি ফিলাডেলফিয়া থেকে চললো নুইয়র্ক। মাত্র আড়াই ঘণ্টার পথ। এই আড়াই ঘণ্টা সময় চার্লি ওড়াতে লাগল তার কল্পনার ফানুস। কল্পনার চোখেই সে দেখতে পেল, মোটা ইয়াবড়া গোঁফওলা এক উকিলকে নাকের উপর চশমা চাপিয়ে চার্লিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে উইল পড়তে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে কত পাবে চার্লি তাই এখন তার চিন্তা।

মস্ত বাড়িটার চারদিকে অনেক খুঁজে আসল অফিসঘরের সামনে এসে চার্লি তো অবাক বনে গেল। আরে এ তো সিনেমার প্রযোজকের অফিস। এদের আবার চার্লিকে কি প্রয়োজন?

কিস্টোন কম্পানীর অংশীদার সেই আদি অকৃত্রিম চার্লস ক্যাসেলের সঙ্গেই কথা হলো। তাঁর বক্তব্য হল যে অনেকদিন আগে একবার একটি থিয়েটার হলে চার্লিকে তিনি মাতালের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফোর্ড স্টার্লির কিস্টোন কম্পানী ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাদের একজন কৌতুকাভিনেতার বড় প্রয়োজন। চার্লিকে অনায়াসেই তাঁরা সিনেমায় নামার একটি সুযোগ করে দিতে পারেন। এখন চার্লির সম্মতি আছে কিনা সে বিষয়ে তাঁদের জানা প্রয়োজন।

সিনেমা প্রসঙ্গ নিয়ে দলের ম্যানেজার রীভসের সঙ্গে চার্লির এর পূর্বেই কথা হয়েছিল। চার্লি চেয়েছিল দুজনে মিলে কার্নোর সব নাটকের ফিল্মী স্বত্ব কিনে নিতে। সেগুলোকে সিনেমা করতে। কিন্তু তিনি কোনও ঝুঁকি নিতে চান নি। আগে থেকেই সাত সতেরো ভাবতে বসলে কি আর পরিকল্পনা কার্যকরী হয়? তাই সরাসরি মঞ্চ

থেকে ছায়াছবির পর্দায় আসার ব্যাপারে চার্লিরও বেশ ভয় করছিল।

কিস্টোন কম্পানীর এই প্রস্তাবে চার্লি আপত্তি বা সম্মতি কি জানাবে তা স্থির করতে পারছে না। কেসেল বললেন, তাদের প্রযোজিত কোনও ছবি এ পর্য্যন্ত চার্লি দেখেছে কিনা! চার্লি বেশ কয়েকবার তাদের ছবি দেখেছে। বড্ড বাজে, অপরিণত মস্তিষ্কের কাজ! তবে কিনা এই কম্পানীর স্থায়ী নায়িকা মেবেল নরম্যাণ্ড চার্লির কাছে একটি বিরাট আকর্ষণ। দেখতে সে অপূর্ব সুন্দর। কালো কফির মত তার দুটি চোখের তারা। তার পাশে কোনও নায়ক বা অভিনেতাকেই আর মনে ধরে না। কিস্টোন কম্পানির ছবিগুলো কোনটাই উন্নত মানের না হলেও প্রচারের দিক থেকে চার্লির অসুবিধে হবে না। একটা বছর তাইরে নাইরে করে কাটিয়ে দিতে পারলেই চার্লিকে আর কে পায়! বিশ্বজোড়া তার পরিচিতি হবে। নামডাক হবে বিস্তর। সিনেমা স্টার তারপর যদি আবার নাটকে এসেও নামে তবে তো আরও ভালো। চারিদিকে একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যাবে। সুতরাং সুযোগটা নিয়ে নিজেকে একবার বাজিয়ে দেখতে দোষ কি? এগুলো অবশ্য চার্লির মনের কথা। এসব কথা গোপন করে চার্লি জানাল যে সে সিনেমায় নামতে রাজী আছে। তারপর চুক্তি হলো। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রতি সপ্তাহে তিনটে ছবিতে অভিনয় করতে হবে—তার মাইনে হবে দেড়শো ডলার। চার্লির তো পোয়া বারো। সে কার্ণোর দলে যা পায় এরা তার দ্বিগুণ দিতে চায়। চার্লি অবশ্য চাইল দুশো ডলার। ক্যাসেল অবশ্য তাঁর অপর অংশীদার সেনেটর সঙ্গে কথা না বলে চার্লিকে কথা দিতে পারলেন না। সেনেট তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। তাই চার্লিকে তিনি পরে জানাবেন বললেন।

চার্লি অবশ্য তাদের উত্তর পাওয়ার আশা পুরোপুরিই ছেড়ে দিয়েছেন। মাইনেটা একটু বেশীই চেয়ে ফেলেছে সে নিঃসন্দেহে।

কিন্তু ভাগ্য তার অনুকূলে। হঠাৎই চিঠি এসে হাজির। চার্লির দাবী পুরোপুরি না মেনে নিলেও তারা জানিয়েছে যে তারা এক বছরের চুক্তি করবে। প্রথম তিনমাস তারা দেবে দেড়শো ডলার করে। পরের নমাস দেবে একশো পঁচাত্তর ডলার করে। চার্লির এবারকার নাটক সফর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চুক্তির নির্দ্ধারিত মেয়াদ শুরু হবে। সুতরাং চার্লি যেন অবিলম্বে সই সাবুদ সেরে ফেলে।

লস্ এঞ্জেলসের এম্প্রেস থিয়েটারে তখন চলছে 'সান্ধ্য আসরে একটি রাত' দারুণ রমরমার সঙ্গে। প্রধান চরিত্র অবশ্যই চার্লির। তাকে সেখানে অভিনয় করতে হয় এক বুড়ো মাতালের চরিত্র। মেকাপের চোটে বয়সটা ঝপ করে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিনয় শেষে একদিন এভাবেই ম্যাক্ সেনেটের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দারুণ স্বাস্থ্যবান জোয়ান চেহারা। চোখেমুখে অটুট সংকল্পের ছাপ। খুব তারিফ করলেন চার্লির অভিনয়ের। চার্লিকে জিজ্ঞেস করলেন কবে নাগাদ চুক্তি শুরু করবে। চার্লি জানাল সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই সে সিনেমার কাজ শুরু করবে। কারণ কার্নোর সঙ্গে তার এপর্য্যায়ের চুক্তি আগস্টেই শেষ। সুতরাং তখন আর তার কোনও বাধ্য বাধকতা থাকবে না।

নতুন পেশা নিয়ে চার্লির নিজের মনের সঙ্গেও চলল বোঝাপড়া। তার এতদিনের দলের পরিচিত আর সবাই দেশে ফিরে যাবে। তাদের শেষ অভিনয় হবে কানসাস সিটিতে। তাদের সঙ্গে জীবনে আর কোনদিনও দেখা হবে কিনা কে জানে। তার ভবিষ্যতও অন্ধকারে। কপালে কি আছে কে বলতে পারে।

চার্লি তার নাটকে অভিনয় জীবনের শেষ দিনে সকলকে খাওয়ালেন। সবাই মিলে পালন করল শোকসভা। এতদিনের পরিচিত সাথীকে ছেড়ে যেতে কারোরই মন চায় না। কিন্তু অনিবার্য্য ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ?

চার্লিদের দলের একজন অভিনেতা, নাম আর্থার ডাণ্ডো, ভারি অপছন্দ করত। সে ভেবেছিল চার্লির অভিনয়জীবনের এই শেষ দিনটিতে বেশ রঙ্গরসিকতা, বিদ্রূপ আর ঠাট্টা করবে। দলের সকলের সঙ্গে ডাণ্ডোরও চার্লিকে উপহার দেওয়ার কথা। হঠাৎ একথা ভেবে চার্লির মনে হলো সারা সময় ডাণ্ডোর উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করে অত্যন্ত অন্যায় করেছে এবং এ বিষয় নিয়ে সে একটি চমৎকার আবেগময় বক্তৃতাও দিয়ে ফেলল। বক্তৃতা শেষে একে একে সবাই বিদায় নিল যখন তখন মনে হলো কই ডাণ্ডো তো তাকে উপহার দিল না। এদিকে তখন চারিদিক ফাঁকা। কার্নোর ছেলেই তখন তার সঙ্গে আছে একমাত্র। সে জানাল ডাণ্ডো উপহার এনেছিল। এক জবরদস্ত বিদ্রূপাত্মক বক্তৃতাও তৈরী করে রেখেছিল বটে তবে চার্লির আবেগপ্রবণ বক্তৃতায় লজ্জা পেয়ে সে আর তার উপহার দিয়ে যায় নি, ফেলে রেখেই চলে গেছে। সেটাতখনও পড়ে আছে দূরে। একটা কাগজের মোড়ক, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। চার্লি খুলে দেখে একটা চুরুটের বাক্স। ডালা খুলে দেখে চুরুটের বদলে সেখানে রাখা আছে রং করা কতকগুলো কাগজের টুকরো। তেলতেলে রং। খুলতে না খুলতে বিশ্রী গন্ধটা ভক করে চার্লির নাকে এসে ঠেকল।

কুড়ি

লস এঞ্জেলস্।

চার্লি এলো ম্যাক সেনেটের সংগে দেখা করতে। এম্প্রেস থিয়েটারে দেখা হবার কথা রয়েছে আগে থেকে। গ্রেট নর্দার্ন হোটেলের ছোট্ট ছিমছাম ঘর থেকে সেজেগুজে চার্লি যখন বেরুলো— তখন সন্ধ্যা নেমেছে। এম্প্রেস থিয়েটার চার্লির পরিচিত। কার্নোর দলের হয়ে এখানে অভিনয় করে গেছে।

নাটক দেখতে দেখতেই ম্যাক সেনেট ফিসফিস করে চার্লির সংগে নায়িকা মেবেল নরম্যাণ্ডের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চার্লির নিজেকে তখন খুব কেউকেটা বলে মনে হচ্ছিলো। নাটক শেষ হলো। হল থেকে বেরিয়ে ম্যাক সেনেট সবাইকে নিয়ে ঢুকলেন দামী এক রেস্তোরাঁতে। খাওয়ার ফাঁকে কথাবার্তা শুরু হলো। সেনেট চার্লিকে বললেন, "আপনার যে এত কম বয়স ভাবতেই পারিনি! মেকআপ করা মুখ দেখে আমি ভেবেছিলাম কম করে চল্লিশ বছর বয়স আপনার! চার্লিরতো সেনেটের কথা শুনে গলায় খাবার আটকে বিষম খাওয়ার মত অবস্থা! শেষে না আবার বয়স কম দেখে খারিজ করে না দেয় ওকে। কোনরকমে শুকনো গলায় চার্লি বলতে পারলো, "বয়স কম বেশী নিয়ে খুব একটা কিছু অসুবিধে হবে না। রঙ চঙ মেখে দাড়ি চড়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাইশ বছরকে বিরাশি বানানেতো কোনও অসুবিধা হবেনা।" খেতে খেতে বড় করে ঘাড় নেড়ে মেবেল চার্লির কথায় সমর্থন জানালেন। চার্লি ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কথায় কথায় ম্যাক সেনেট বললেন, "আসলে কি জানেন মিঃ চ্যাপলিন। আমাদের কোম্পানীর দুই নায়কেরই বয়স হয়েছে।

ত: ধরুন, ফোর্ড স্টার্লিংয়ের চল্লিশ পেরিয়েছে। ফ্রেড মেসেরতো কম করে পঞ্চাশ বছর হবে। ওদের তুলনায় আপনিতো নেহাৎই শিশু।” হা-হা করে হেসে উঠলেন সেনেট।

খাওয়াদাওয়া শেষে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সেনেট গাড়ি করে চার্লিকে তার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবার আগে বলে গেলেন, “কাজ শুরু হতে এখনও দেরী আছে আমার। তবে আপনি আমাদের কাজকর্ম দেখুননা এসে। কাল থেকেই রোজ চলে আসুন স্টুডিওতে। সব কিছুর সংগে চেনাজানা হয়ে যাবে। ভালোই লাগবে বলে মনে হচ্ছে আমার!” দেড়শো-দুশ বর্গফুট এলাকা ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেট পেরোলেই বাগান। মাঝখান দিয়ে সুরকিঢালা পথ। পথের শেষে ছোট্ট এক বাংলো বাড়ি। কিস্টোন স্টুডিও। লস এঞ্জেলস শহরের শেষ মাথায় এডেলডেল—নতুন গড়ে ওঠা এক মফস্বঃল শহর। খামার, কারখানা আর তারকাঁটা ঘেরা ফাঁকা মাঠ আর চাষবাসের জমির ফাঁকে ফাঁকে দোকান পাট। চার্লিতো খুঁজে খুঁজে হয়রান কেউই কিস্টোন স্টুডিওর হদিশ দিতে পারেনা। শেষে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে কিস্টোন স্টুডিওর পাত্তা মিললো। কিন্তু গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে চার্লি। ঢুকতে আর সাহস পায়না কিছুতেই। কাউকে চেনেনা জানেনা—কে কি বলবে বা ভাববে ঢুকলে—এইভেবে চার্লি দাঁড়িয়ে রইলো, যদি ম্যাক সেনেট বাইরে বেরিয়ে আসেন এই আশাতে। দুপুরে টিফিনের সময়ে একদল অভিনেতা-অভিনেত্রী হৈ—হৈ করতে করতে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। মুখে তখন ও রঙ-চঙ মাখা। কিস্টোন স্টুডিওর উল্টো দিকের রেস্টুরেন্টে খেতে ঢুকলো ওরা। চার্লির দিকে কারুর নজরই পড়লোনা। নিজেকে নিয়েই আত্মহারা ওরা। খাওয়া সেরে আবার শোরগোল তুলে স্টুডিওতে ঢুকে পড়লো ওরা। রকমসকম দেখে চার্লির সমস্ত সাহস উবে গেল। এম্নিকরে তিনদিন স্টুডিওর

দরজা থেকেই ফিরে এলো চার্লি। ভেতরে ঢোকার সাহস হলোনা !

তিনদিন পরের কথা। রাতে হোটেলে ম্যাক সেনেটের ফোন এলো। তিনি অনুযোগ করলেন চার্লি স্টুডিওতে যাচ্ছেনা বলে। চার্লি কথা দিল যে সে অবশ্যই পরদিন যাবে।

পরদিন চার্লি গটগট করে সোজা হেঁটে ঢুকে গেলো স্টুডিওতে। দেখা করলো স্যার সেনেটের সংগে। ম্যাক সেনেটই ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখালেন চার্লিকে। টানা হলঘর। তাতে পাশাপাশি তিনটে সেট। ওপরটাতে চাল নেই—ফাঁকা। পাৎলা লিনেন কাপড়ের চাঁদোয়া টানানো হয়েছে যাতে সূর্যের আলোতে সারা ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে। আলো না পেলে ছবি তোলা যায় না। চার্লিতো দেখে অবাক। মনে মনে ভাবনা হলো ওর। ঝোঁকের মাথায় অভিনয়ের দল ছেড়ে এসে শেষে পস্তাতে হবেনাতো !

দু'একজন অভিনেতার সংগেও আলাপ হলো চার্লির। ফোর্ড স্টার্লিং বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা। ফোর্ডের প্রতিকল্প হিসাবেই চার্লিকে নেওয়া হয়েছে কিস্টোন স্টুডিওতে। ফোর্ড নিজে ছবি করতে চলেছেন ইউনিভার্সাল কোম্পানীর সহযোগিতায়। তাই ছেড়ে যাচ্ছেন কিস্টোন স্টুডিও। ফোডকে সবাই তখন হাসির রাজা বলেই মনে করতো। চার্লি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সেটে অভিনয় অর্থাৎ স্যুটিং দেখছিলো। ওর অবাক লাগলো একটা ব্যাপার দেখে। ছোট বড় মাঝারি সব অভিনেতারই প্রানান্ত চেষ্টা হলো কতটা নিখুঁতভাবে ফোর্ডকে অনুকরণ করা যায়।

তবে স্টার্লিংয়ের কাজ চার্লির মোটেই ভালো লাগলোনা। হাঁটা চলা, কথা বলা, খাওয়া, ওঠা বসা সবাই ওলন্দাজদের কায়দাতে করতে ভালবাসতেন স্টার্লিং। চার্লি অবাক হয়ে চতুর্দিক দেখেবেরায়। অবাক হয় ছোট্ট বাংলোর ভেতরে ঘরের ভাগাভাগি দেখে। মেবেল নরম্যাণ্ড নামীদামী নায়িকা তার জন্য আলাদা সাজঘর। সেখানে

অন্য কেউ ঢুকতে পারেনা। দলের অন্য মেয়েদের সবার জন্য একটাই সাজঘর সেনেট, স্টার্লিং আর রসকোর জন্য পৃহক সাজঘর। সেনেট জানালেন, চার্লি ওঁদের সংগেই মেকআপ নেবেন। এছাড়া বাকী সব ঝড়তি পড়তি অভিনেতাদের জন্য একটাই সাজঘর বরাদ্দ।

এদিকে দুশ্চিন্তায় চার্লির পাগল হবার উপক্রম। ম্যাক সেনেট চার্লিকে কাজের কথা কিছুই বলেন না। সারাদিনে চার্লির সংগে একটিও কথা বলেন না কোন কোনদিন। চিন্তায় যেন মশগুল হয়েই চার্লির সামনে দিয়েই হেঁটে চলে যান সেনেট—অথচ চার্লিকে যেন দেখতেই পেলেন না। ঝোঁকের মাথায় চার্লিকে নিয়ে ফেলে এখন পস্তাচ্ছে নাতো সেনেট। যে কোন দিন চার্লিকে জবাব দিয়ে দেবে হয়তো, ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে চার্লি। এমি করে এক সপ্তাহ কাবার হলো। এলো শনিবার। চার্লিকে দেখেই ম্যাক সেনেট মুচকি হাসলেন—'মিঃ চ্যাপলিন, অফিসে গিয়ে মাইনেটা নিয়ে নিন। পরে কথা হবে।" চার্লি যেন দম দেওয়া পুতুলের মতই বলতে পারলো, 'মাইনে পরে নেবো। আগে আমাকে কাজকর্ম করতে দিন। বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠছি' 'সব ঠিক হবে—কিছু ভাববেন না। আগে মাইনেটা নিয়ে আসুন—অফিস বন্ধ হবার সময় হলো।'

দিন গড়িয়ে চলেছে। চার্লির স্নায়ুতে চাপ পড়ে ভীষণ। মাইনে পাচ্ছে। কাজ মিলছেনা। অথচ নানা রকম বিষয়ে সেনেটের সংগে কথা হয় ওর। এমনকি চার্লি স্টার্লিংয়ের অভিনয়ের বিষয়েও ওর মতামত জানাতে ভুললোনা। সেনেট মন দিয়ে সব শোনেন। স্যুটিং শেষে গাড়ি করে শহরের শেষ মাথাতে ওঁর আড্ডাতে—আলেক-জান্দ্রিয়া হোটেলে নিয়ে যান। আলাপ করিয়ে দেন ওঁর বন্ধুবান্ধবের সংগে।

আলেকজান্দ্রিয়া হোটেলে চার্লির সংগে আলাপ হলো লেমার এলসওয়ার্থের। আঁতেল বলে বুদ্ধিজীবী মহলে ওঁর খুব প্রতিপত্তি। খিটখিটে মেজাজের বিটকেল চেহারা। কুতকুতে ক্ষুদে চোখে

দুনিয়ার শয়তানীবুদ্ধি। কুকুরের মত লম্বাটে মুখে দাড়ি গোঁপ গজানোর লক্ষণ নেই। সামনের দুটো দাঁত ও নেই। আলজিভ চোখেপড়ে। কিন্তু মানুষটি হাসাতে আর লোকের পিছনে লাগতে ছিলেন ওস্তাদ। চার্লির পেছনে সব সময় ফোঁড়ন কাটতেন বিশ্বাসই করতে চাইতেননা। বিশ্বাসই করতে চাইতেন না যে চার্লির কৌতুক অভিনেতা হবার মত এলেম আছে। ফোর্ড পর্যন্ত প্রতিবাদ করতেন, মাতালের ভূমিকাতে এম্পেস থিয়েটারে চার্লির অভিনয়ের দারুণ প্রশংসা করতেন। কিন্তু ভবী ভোলার নয়। এলসার এলসওয়ার্থ বলে উঠতেন, "ওই সেই মাতাল। এবার মনে পরেছে। দূর! দূর! ওটা কি অভিনয় হলো! দেখেতো হাসির বদলে আমার কান্না পাচ্ছিলো।" এম্নি সব মন্তব্য। চার্লির শুনে হাড়পিত্তি জ্বলে যেতো।

অবশেষে সুযোগ এলো। সেদিন ম্যাক সেনেট শুটিংয়ের জায়গা ঠিক করতে গেছেন। সংগে রয়েছেন মেবেল নরম্যাণ্ড। ফোর্ড তার নিজের কাজে শহরের বাইরে গেছেন। স্টুডিও প্রায় ফাঁকা। হেনরি লেহরম্যান ছবি তুলছিলেন। হঠ্যাৎ লোকের দরকার পড়লো। একজন লোক খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করেন। চার্লিকে তিনি সে ভূমিকাটিতে নামতে বললেন। চার্লি দারুন খুশী। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। হেনরি লেহরম্যান অভিজ্ঞ পরিচালক। প্রচুর ছবি করেছেন। স্টুডিও তে সেনেটের পরেই ক্ষমতা তাঁর। তবে ছবি করার ব্যাপারে লেহরম্যান ছিলেন খুবই যান্ত্রিক। রসকষ বর্জিত। একই নিয়মে—একই ছকে ফেলা সব ছবি। নিজেকে ঘিরে তাঁর ছিলো দারুণ অহংকার। প্রায়শঃই বলে বেড়াতেন, "ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী লাগেনা মশাই। ওকে ছবি ফেলে করবো। সব নিজের গতিতে এগোবে। অভিনয়,, করিয়ে নেবো। বাদবাকী যা ত্রুটি—সম্পাদনায় মেরে দেবো।" চার্লিতো আগে থেকেই এঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। চিত্রনাট বলতে কিছু থাকে না। যাহোক কিছু একটা নিয়ে প্রথমে শুরু করা হয়। তারপর ছবি যত

এগোতে থাকে ততই গল্পের গরু গাছে চড়তে থাকে—নানারকম মালমশলাও পড়ে তাতে। চিন্তার খোরাক ভিড় করে যেন। ক্যামেরাম্যান সব তুলে নেয় পরপর। যেভাবে যেমন করে ছবি আরম্ভ হোকনা কেন, ছবি শেষ হবেই দৌড় দিয়ে। চার্লির কাছে ব্যাপারটাখুবই বুদ্ধিহীণ আর বিরক্তিকর ঠেকতো।

বুক চেরা আঁটোসাটো কোট, মাথায় টুপি আর মুখে সামান্য ছাগলদাড়ি এঁটে চার্লি অভিনয় করতে তৈরি হলো। চার্লির মাথাতে গজগজ করে উঠলো তুনিয়ার মতলব।···কাগজের সম্পাদকের সংগে দেখা করতে গেলো রিপোর্টার চার্লি···এভাবে ছবির গতি এগোতে থাকলো। যতদুর সুন্দর করে বলা যায়—সেভাবে চার্লি অভিনয় করলো নিজে—অন্য সবাই যাতে সুযোগ পায় অভিনয়ের তার দিকেও নজর রাখলো। সবাই খুব প্রশংসা করলো চার্লির। পরিচালক লেহরম্যানের মাথা থেকে যদিও নতুন কিছুই বেরোলনা—তবু ও খোদার ওপর খোদগারি করলেন তিনি এডিটিং করার সময়। কেটেকুটে সব উড়িয়ে দিলেন। চার্লির অংশটুকুর প্রায় সবটুকুই বাদ পোরলো। চার্লিতো ভেবে অবাক। কোন কারণই খুঁজে পেলোনা। লেহরম্যান পাছে চার্লির কাছে বিদ্যাবুদ্ধিতে ছোট হয়ে যান সবার কাছে—এই ভেবে চার্লিকে দেখে নিলো এক হাত আর কি।

॥ একুশ ॥

সেদিন চার্লির হাতে কোন কাজ নেই। অন্য দিনের মতই সে ফ্লোরে শুটিং দেখছিলো। সেটের একপাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছে আর মনে মনে কামনা করছে যাতে করে ম্যাক সেনেটের ভাল হয়। মুখে চুরুট, চিন্তান্বিত মুখে তিনি সদ্য সমাপ্ত হোটেলের সেটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। পাশেই ছিল মেবেল চার্লির দিক চোখ পড়তেই ইশারায় কাছে ডাকলেন সেনেট। বলে উঠলেন, "চটপট যাহোক একটা মেকআপ নিয়ে আসুন তো, হাসির দৃশ্যের অভিনয় করতে হবে এটা মাথায় রাখবেন।" চার্লি তো পড়ল মহা বিপদে। কী পোষাক পড়া যায়। আগের বারের মত রিপোর্টারের পোষাকটা পরবে কিনা, ভাবল একবার। নিজেই নাকচ করে দিল। ভাবতে ভাবতে সাজঘরে ঢুকল চার্লি। মগজে একের পর এক চিন্তা ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনটাই পছন্দ হচ্ছিল না ওর। শেষে ঠিক করল উল্টোপাল্টা বেশে বেমানান পোষাকেই নিজেকে সাজাবে সে। চার্লি গায়ে চাপাল আঁটোসাটো কোট, নীচে মস্ত ঢোলা প্যান্ট. মাথায় ছোট্ট চাপা টুপি, এদিকে পায়ে মস্ত বড় জুতো। হাতে আবার এক ছড়ি। ওদিকে আবার নাকের নীচে প্রজাপতি মার্কা গোঁফ। বয়সের কোনও গাছপাথর নেই। যুবক, প্রৌঢ়, না থুত্থুড়ে বুড়ো। কোনটারই আগামাথা খুঁজে পাওয়া যায় না দেখে। যদিও সেনেট চার্লিকে বুড়োর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেই পছন্দ করেছিল। সাজসজ্জাটা বুড়োর না হলেও বুড়োটে দেখাতে অসুবিধে হবে না। সাজ নাহয় হলো। কিন্তু চরিত্রটা কেমন হবে? কি করে লোকটা, কি তার কাজ? পোষাক পরার পর মুহূর্ত থেকেই চার্লির চোখের সামনে লোকটার সব পরিচয় যেন ফুটে উঠতে লাগল অবিশ্বাস্য

দ্রুততায়। ছড়ি ঘুরিয়ে সেনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল চার্লি। উদ্দেশ্য হীন ভাবেই পোষাকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এদিক সেদিক খানিকটা হাঁটল। হাঁটে থামে, আর মাঝে মাঝে বেতটা এ হাত থেকে ওহাতে নেয়, কখনও বা কায়দা করে দুহাতেই ধরে থাকে। এযেন চার্লি নয়। চরিত্রটাই হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। চার্লির আর কোনও ভয় নেই। কেমন করে, কীভাবে, কি কি সে করতে পারে সব মতলব একের পর এক চার্লির মাথায় খেলে যাচ্ছে।

এদিকে চার্লিও হাঁটা চলা তাকানো আর ধরনধারণ দেখে ম্যাক সেনেটের মুখে চাপা হাসি ফুটল। তারপরেই আর থাকতে না পেরে ফ্লোর কাটিয়ে সে কি অট্টহাসির তোড়। সেনেটের চরিত্রে, এ এক অদ্ভুত গুণ। সাফল্যের বিরাট দিক। সব কিছুতেই ওঁর আগ্রহ উৎসাহ আর উদ্দীপনার চোখ ধারালো হয়ে ওঠে। চার্লিকে এত মনে ধরাতে তাই হো-হো করে হাসতে দ্বিধা করেননি তিনি। ওঁর মুখে হাসি দেখে চার্লিও খুশী মনে চরিত্রটি ব্যাখ্যা করে যেতে শুরুল, —"ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলাগণ, চরিত্রটি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবেন না দয়া করে। আসলে ইনি বড় বৈচিত্র্যময় কখনও বা ভবঘুরে যাযাবর, কখনও বা চিন্তাশীল, কখনও বা শুধুমাত্র ভালমানুষ ভদ্রলোক একজন, আবার কখনও বা কবে অথবা 'রোমান্টিক অথবা দুঃসাহসী তীরন্দাজ। কিন্তু ইনি বড় নিঃসঙ্গ, একা। সারা দুনিয়ায় নিজের বলতে তাঁর কেউই বড় একটা নেই। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে—তিনি কখনও বা গায়ক, কখনও ডিউক। কখনও সুদক্ষ পোলো খেলোয়াড় অথবা একজন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক। দোষও আছে দু একটা তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ফেলে দেওয়া আধপোড়া সিগারেট কুড়িয়ে নিয়ে খেতে তাঁর দ্বিধা হয় না, এমনকি বাচ্চাদের হাত থেকে খাবার কেড়েকুড়ে খেতেও তাঁর জুড়ি নেই। রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকে না, আর রাগের মাথায় সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, মারতে দ্বিধা করেন না।"

এইভাবে একনাগাড়ে দশ মিনিট চার্লি বকে গেল, সেনেট খুব খুশী। বললেন, "থাক থাক। আর ব্যাখানে কাজ নেই। দয়া করে সেটে যান দেখি। কাজ শুরু হলে দেখা যাবে ক্যামেরার সামনে কেমন মজা করতে পারেন।"

চার্লি চলল সেটে। ছবির গল্প মোটামুটি তার জানা। মেবেল নরম্যাণ্ড বিবাহিতা হলেও তাঁর আরও একটি প্রেমিক আছে। সেই চিরাচরিত ত্রিকোণ প্রেম আর কি! বাকিটা চার্লিদের হাতে।

চার্লি ভাবতে লাগল কি ধরণের মজার কায়দা দেখাবে। কারণ মজার ছবির অর্থ হলো নতুন নতুন মজার কায়দা দেখিয়ে দর্শককে হাসানো। অনেক ভেবে ভেবে চার্লি একটা মজার কায়দা উদ্ভাবন করল। সেটে ঢুকল এমন ভাবে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে ভীড়ের মধ্যে গা বাঁচিয়ে ঢুকে পড়েছে, তার ঢোকার কথা নয় যেন। চরিত্রটা একটা ভবঘুরের। ঢোকার সময়েই একটা কাণ্ড! এক ভদ্রমহিলার পা মাড়িয়ে দিল চার্লি। ভীষণ লজ্জিত হয়ে টুপিটা খুলে অমনি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল চার্লি। ওদিক থেকে ফিরে দুপা এগোতেই আবার এক কাণ্ড! পাশে রাখা থুতু ফেলার পাত্রের সঙ্গে লাগল বিরাশী সিক্কার এক ধাক্কা! ব্যস ধপ করে পড়ল উলটে। আবার তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে অনুরূপভাবে পাত্রটার কাছে আবার মাপ চাইল। ওদিকে চার্লির রকম সকম দেখে দর্শক তো হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

চারিদিকে তাকিয়ে চার্লি দেখে সেটের সব কাজ বন্ধ করে সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। চার্লির অভিনয় শক্তি দেখে তারা তো অবাক। সবাই হাসছে। এমনকি ফোর্ডের মুখেও দেখি হাসি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল চার্লির। যাক্ বিরাট বড় স্বীকৃতি পেল আজ চার্লি। সুটিং এর কাজ সেরে নিজের জামাকাপড় ছাড়তে গিয়ে চার্লির সঙ্গে দেখা হলো ফোর্ড আর রসকোর। এঁরা দুজনেই চার্লিকে স্নেহের চোখেই দেখতেন। কিন্তু সেদিন যে কি হলো। তারা

হাসলেনও। কিন্তু চার্লির মনে হলো আগের সেই প্রীতির সম্পর্কটা কোথায় যেন চির খেয়েছে। কেমন যেন একটা তালভঙ্গ হয়েছে! চার্লি অবাক।

ওদিকে তখন আর এক সমস্যা। এখন ব্যাপারটা হলো চার্লি মজার কাণ্ডটা ফিল্মের ফিতের দৈর্ঘ্যে পঁচাত্তর ফুট গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতদিন সাধারণতঃ এসব দৃশ্য হয়েছে খুব জোর দশ ফুট থেকে বারো ফুটের মধ্যে। সেনেট আর লেহরম্যান খুব চিন্তায় পড়ল ব্যাপারটা নিয়ে। চার্লিকে জিজ্ঞেস করাতে চার্লি বলল, "মজার ব্যাপারটা যেখানে মুখ্য, দৈর্ঘ্য কতটা তা হয়েছে নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ কি?" একটু ভেবে অযথা কাঁচি আর না চালিয়ে ওটা পুরোপুরিই রাখা হলো। বেশ জমেছে যাহোক অভিনয়টা। পোষাকটাও ঠিক নির্বাচিত হয়েছে ভেবে ওটা আর বদ্‌লাবার প্রয়োজন আছে চার্লির তা মনে হলো না।

এক বন্ধুর সঙ্গে হোটেলে ফিরল চার্লি। বন্ধুটি তাদের সঙ্গে ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করে। খুব সরল সাদামাটা ছেলে। বলল, "চার্লি, তোমার অভিনয় অপূর্ব হয়েছে। এমনকি ফোর্ড পর্য্যন্ত তোমার অভিনয় দক্ষতায় অবাক হয়েছেন। মুখটা যা তাঁর হয়েছিল না তখন, তুমি যদি একবার দেখতে!" চার্লি কিন্তু তখনও দর্শকদের কথা ভেবে চলেছে। দর্শকরা তার অভিনয় কিভাবে নেবে কে জানে! তারাই তো আসল সমঝ্‌দার তার কাজের।

কদিন পরের কথা। চার্লি তখন আলেক্‌জান্দ্রিরায়। গিয়ে শোনে ফোর্ড তাঁর বন্ধু এলমার এলসওয়ার্থকে চার্লির সেদিনকার সেই অভিনয় দৃশ্যের রগড়ের কথা বলে চলেছেন।

চার্লি এত ভবঘুরের চরিত্রটি এমন একটি নতুন মজার আঙ্গিকে ফেঁদেছে যা একেবারেই অভূতপূর্ব অথচ অবাস্তব বলতে পারবে না কেউই। যেন সে একটি উল্‌টো বাঙ্গাল। করতে যায় এক হয় আর এক। যা করতে যায় সব হয়ে যায় তার উল্টোটি। করতে

যায় এক আর হয় আর এক, যা করতে যায় সব হয়ে আর এক. যা করতে যায় সব হয়ে যায় উল্টো। মাথায় তার নানারকম উদ্ভট উদ্ভট বুদ্ধি সর্বদা যেন গজ গজ করছে।

চার্লি অভিনয় মহা ব্যস্ত। রাত্রে যখন তার সেই পূর্বপরিচিত বন্ধুটির সঙ্গে হোটেলে ফেরে তখন তার কাছে থেকেই তার অভিনয় কোথায় কেমন হয়েছে তার ভাল মন্দর ব্যাখ্যা শোনে! মোদ্দা কথা তার অভিনয় সকলেরই চোখে ধরেছে। এমনটা যে করা যায় তা আগে কেউ ভাবতেই পারত না।

সেনেটের সঙ্গে ছবি করার সময় সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবে অভিনয় করত চার্লি। নানারকম মজাদার সব কায়দা আয়ত্ব করে অভিনয় করত। কি করবে গল্প তো কিছু আর নির্দিষ্ট করা নেই। কখনও কখনও ছোট খাটো কোন পরিকল্পনা চার্লির মাথায় আসলে সেনেটকে বললে তিনি তা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতেন না। ভেবে চিন্তে অনেক সময় তা কাজেও লাগাতে চেষ্টা করতেন। এভাবে চার্লির মনে মনে আত্মবিশ্বাস বাড়তে লাগল। মনে মনে সর্বদাই কল্পনার জাল বুনে চলেছে চার্লি। নিজের যে সৃষ্টিধর্মী কাজ করার ক্ষমতা আছে তা চার্লি ভালই জানত। অভিনয় করার সময় নিজে নিজেই সব ভেবে চিন্তে করত। কারোর নির্দেশনার প্রয়োজন হত না। চার্লির মনে হত তবে তো সে চেষ্টা করলে পুর্ণাঙ্গ গল্প কোনদিন লিখে ফেলতে পারবে। কিন্তু সে কথা এখন ভেবে লাভ কি? এখন তার একটাই কাজ। কি করে দর্শকদের কাছে প্রশংসা পাওয়া যায়, কি করে তাদের স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে হাসানো যায়। তবেই তো তার অভিনয় ক্ষমতার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে।

এর পরেই শুরু হলো লেহরম্যানের সঙ্গে ছবি। ফোর্ডের সঙ্গে সঙ্গে তার ও চুক্তি শেষ হয়ে গেছে কদিন আগেই কিন্তু নেহাতই সেনেটর সুবিধে অসুবিধের কথা ভেবে আর দু সপ্তাহ বিনা মাইনের কাজ করে দিচ্ছে এই ঢের। কাজ শুরু হলে সেনেটকে যেন দু একটা

পরামর্শ দিত চার্লি, লেহরম্যানকে ও তেমন দুটো একটা পরামর্শ দিতে চাইলে সে তা মোটেই মানতে চাইত না। বলত যা থিয়েটারে মানায় সিনেমাতে তা মানায় না। চার্লির ঐ সব অতি নাটুকেপনা সিনেমায় একেবারেই অচল। চার্লির সিনেমার ধাত বোঝার ক্ষমতা নাকি একেবারেই নেই। চার্লি বলত, "মজা, সে তো মজাই। থিয়েটারে একরকম মজা করতে হবে, সিনেমায় আরেকরকম ভাবে— এ আবার হয় নাকি? মজার আবার রকমভেদ আছে নাকি! কিন্তু লেহরম্যান মানে না। তার সিনেমা শেষ হত ছকে বাঁধা রীতিতে। এ ওকে তাড়া করে ফিরছে, সে তার পেছনে দৌড়াচ্ছে—এই রকম ধরণেরই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। লেহরম্যানের ধারণা সিনেমা আর থিয়েটারের মধ্যে তফাত আছে। থিয়েটার চলে ধীর গতিতে আর সিনেমার আসল কথাই হলো গতিশীলতা। এই গতিশীলতা বজায় রাখতে হলে অভিনেতাকেও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে হবে, নয়তো ছাদের উপর থেকে লাফঝাঁপ দিতে হবে এই আর কি। 'চার্লির মন সায় দেয় না। লাফিয়ে চুরিয়ে দুটো একটা নতুন কায়দা ছেড়ে দিলেও সম্পাদনার সময় ঠিক কাঁচি চলত।

লেহ্‌রম্যান যে সেনেটের কাছে চার্লির নামে অভিযোগ করত তা চালির জানা কথা। কিন্তু এতে সেনেট আমার উপর বিরক্ত হতেন কিনা তা অবশ্য চার্লি বুঝতে পারত না। লেহ্‌রম্যান চলে গেলেও চার্লি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারল না। এবার এলো নিকলস। তার গর্ব সে এ লাইনে বহু দিন ধরে পোক্ত। সে নাকি সিনেমা শিল্পের গোড়ার থেকেই আছে। কিন্তু আসলে লোকটা একটি অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঁধাধরা কতকগুলো গৎ ছাড়া তার কাছে নতুন আর যা কিছু সবই নিতান্তই বাজে। চার্লি নতুন কিছু করতে গেলে অথবা বলতে গেলে সে তো রেগে আগুন হয়ে ওঠে। অভিনয় বলতে গেলে ফোর্ডের অন্ধ অনুকরণ। এর বাইরে কিছু করলেই তার একটুও পছন্দ হয় না। চার্লি বুঝতে পারল তার নামে

সাতকাহন করে লাগানো ভঙ্গানো চলছে সেনেটের কাছে।

এর মধ্যেই সেনেটের করা সেই আগেকার ছবিটা বাজারে মুক্তি পেয়েছে। নাম Mabels strange Predcanent, ছবিটা মুক্তি পেয়েছে জেনে চার্লির বুক কাঁপতে লাগল। হলে গেল একদিন। সিনেমার পর্দায় ফোর্ডের ছবি ফুটে উঠতেই দর্শকের সে কি হাসি! চার্লিকেও দেখল। অত যে রগড় করল চার্লি, কই কেউ তো অত হাসল না। কিন্তু আস্তে আস্তে মোড় ঘুরল। চার্লির রগড় দেখে দর্শকরাও হাসতে শরু করল। ক্রমে বেড়েই চলল হাসির ফোয়ারা। কোনও কোনও জায়গায় ফোর্ডকে বাদ দিয়ে চার্লিকে দেখেই তারা হাসতে শুরু করল বেশী। চার্লির ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। থাক দর্শক তাহলে তাকে নিয়েছেও নতুন মুখকে যে দর্শক পাত্তা দেয় না একথা তাহলে তো ঠিক নয়। ফোর্ডের পাশে জায়গা করে নেওয়া সে কি সহজ ব্যাপার

এত করেও সেনেটকে কি খুশী করতে পেরেছিল চার্লি? মনে হয় না। আসলে দর্শক চার্লিকে যতটা পছন্দ করতে শুরু করেছিল তার সিকি ভাবেও পছন্দ করতে পারে নি ম্যাক সেনেটের পরিচালকেরা। এই যেমন নতুন ছবি নিয়ে কাজকর্ম শুরু করতেই নিকলসের অভিযোগ চার্লির বিরুদ্ধে। কিনা চার্লির সঙ্গে কাজ করা নাকি ওদের পোষাচ্ছে না। ম্যাক মেনেট ডেকে পাঠিয়ে অভিযোগ করলেন, "কি ব্যাপার, মিঃ চ্যাপলিন, সবাই বলছে আপনাকে নিয়ে নাকি কাজ করা যায় না। আপনি নাকি কাজে বগড়া দেন। কারোর কথা শুনতে চান না?" "তা তো হওয়ার কথা নয়। ছবির ভালোর জন্যই আমি নতুন কিছু উদ্ভাবনী রীতি—নীতির নিয়ে ভাবি। সৃজনশীলতার জন্য ভাবা যদি অন্যায় হয় তাললে হয়ত আমি, অপরাধী।" চার্লি মুখে সবশুনেও থমথমে গলায় সেনেট বলে উঠলেন, "এখন থেকে আপনাকে যা করতে বলা হবে আপনি তাই-ই করবেন। তাতেই আমরা সবাই খুশী হব।"

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলো চার্লি। কন্তু পরদিনই শুটিং এর সময় যথারীতি নিক্লসের সঙ্গে ঝামেলা আর তর্কাতর্কির একশেষ! শুটিং বন্ধ হওয়ার উপক্রম। চার্লিও ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল "দেখুন, মিঃ নিক্লস্ আমি এখানে দেড়শো ডলার করে মাইনে পাই। এটা ভুলে মেরে দেবেন না। এর পর থেকে আপনার ঐসব বাজে বস্তা-পচা আলতু ফালতু কাজ কর্মের প্রয়োজন হলে তিন ডলার মাইনের কোনও শিল্পীকে দিয়ে করাবেন। আমার দরকার হবে না। আমি ওসব পারব না।"

নিকলস্ তো চার্লির কথা শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উত্তেজনায় তোতলাতেই শুরু করল "দ্যাখ হে ছোকরা, অত ভড়ং কর না। তুমি তো কাল এখানে এসেছ আমি দশ বছর ধরে সিনেমা লাইনে আছি। কি করব না করব তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে না।" চার্লি অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় অনেক করে নিকলসকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। দলের অন্য সবাইও চার্লিকে সমর্থন করল না। সবাই উলটে চার্লিকেই দোষারোপ করল—"না, না। এভাবে বলা আপনার ঠিক হয় নি। হাজার হোক, লোকটা সিনেমার শুরু থেকে এই কাজ করছে। আর আপনি সেদিন এসে কিনা যা নয় তাই বললেন। চার্লি বুঝল এদের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। ছকের বাইরে কিছু ভাবতে শেখে নি এরা।

এতদিনে চার্লি বুঝতে পেরেছে—ছবির শুটিং এর মাঝখানে চার্লির নতুন অভিনয় রীতির সবটাই এরা কেটেকুটে বাদ দিয়ে দেয়। কিন্তু ঢোকার সময় আর বেরোবার সময়টা চার্লি যেরকমই অভিনয় করুক না কেন এরা কেটে বাদ দিতে পারে না। বাধ্য হয় রাখতে। চার্লি এই সুযোগটাকে কাজে লাগাল। ওর যতসব কাণ্ড কারখানা তখনই জুড়ে দিতে থাকল। ব্যস, কাটা পড়ত না।

অন্য সবার ছবি করার ব্যাপার ট্যাপার দেখে ঘেন্নায় বা দুঃখেই হোক চার্লি নিজেই গল্প লিখে ছবি পরিচালনা করবে ঠিক করল।

সেনেটকে যখন বলা হলো তিনি ব্যাপার টায় কোনও গুরুত্ব দিলেন না। অথচ মেবেল নরম্যাণ্ড পরিচালিকা হলেন। তাঁর ছবিতে চার্লিকে কাজ করতে বলা হলো, চার্লির মনে ব্যাপারটা খুব দাগ কাটল। ছবি তোলার মত গুরু দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার কোনও রকম যোগ্যতাই মেবেলের—ছিল না। একদিন লস্ এঞ্জেলস্ শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে বড় একটা রাস্তায় শুটিং চলছিল। দৃশ্যটা ছিল রাস্তা দিয়ে খল নায়ক গাড়ী করে আসবে। চার্লি রাস্তার জল দেওয়ার গোল পাইপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতেই আটকে গাড়ী থামতে বাধ্য হবে, চার্লিকে বলা হল পাইপটা নিয়ে দাঁড়াতে। এদিকে চার্লি তখন ভেবে নিয়েছে পাইপ নিয়ে একটু কাজকর্ম করবে। পাইপের উপর উঠে দাঁড়াবে জল আর বেরোবেনা তখন। জল কেন আসছে না দেখার জন্য যেই নীচু হবে অমনি পাইপ থেকে সরে যাবে পা। মূহূর্তে চোখে মুখে নেমে আসবে জলের—ধারা। জল ছিট্‌কে ধুমধুমার কাণ্ড হবে! মেবেল সব শুনে নাক কুঁচকে সব বাতিল করে দিল "এসব করার সময় নেই।„ আপনি একটু কম ভাবুন আপনাকে যা বলছি তাই করুণ। মেবেলের কথায় চার্লির ধৈর্য্যেরও শেষ হলো। পরিষ্কার মুখের উপর জানিয়ে দিল—"সোজা কথা, আমি পারব না। আপনি যা বলছেন এসব বাজে কাজ আমি করব না। এ ছাড়া আরেকটা কথাও আপনার জেনে রাখা দরকার। আমাকে নির্দেশ দেবার মত কোনও রকম যোগ্যতাই আপনার আছে বলে আমি মনে করি না।" কথা শেষ করেই তীরের মত রাস্তার মাঝয়ান থেকে ছিটকে সরে পড়ল চার্লি। ব্যাপারটা এই দাঁড়াল। চার্লির কথা মেনে না নিলে স্যুটিং হবে না। লজ্জায়, অপমানে আর রাগে মেবেল লাল হয়ে উঠলেন। চার্লি যখন কোনও অন্যায় বিনয়ে রাজী হল না তখন মেবেলও রেগে উঠে শুটিং বন্ধ করে দিল। দেখতে দেখতে বিকেল হলো। রোদও চলে যাচ্ছে। শুটিং করা আর সম্ভব নয়। স্টুডিওতে ফিরে এসে চার্লি যখন সাজঘরে মুখে রং তুলছিল তখন

সেনেট এসে হাজির। "কি ব্যাপার। এসব কি আরম্ভ করেছেন আপনি ?" রাগে ফেটে পড়ল সেনেট। "দেখুন, আমি যা কিছু ভেবেছিলাম ছবির স্বার্থেই। কিন্তু মিস্ গরম্যাণ্ড কোনও কিছুই জানতে চান না।" "কোনও মানাটানার ব্যাপার ট্যাপার নেই, মেবেল যা করতে বলবে তাই-ই করতে হবে আপনাকে। ওতে যদি আপনার না পোষায় সিধে পথ দেখুন। আপনার ওসব চুক্তি টুক্তির ধার আমি ধারি না।"

দেখুন মিঃ সেনেট, ব্যাপারটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ? এখানে আসবার আগে আমি অভিনয় করে পেট চালাতাম আপনি তাড়িয়ে দিলেও না খেতে পেয়ে আমি মারা যাব না। আমি জানি কেমন করে অভিনয় করতে হয়। আরেকটা কথা আপনি যেমন ভাল ছবি করতে চান তেমনি মনে প্রাণে আমারও তাই ইচ্ছে। আর সেজন্যই ভালমন্দ, পছন্দ, অপছন্দ নিয়ে তর্কবিতর্ক হয় এতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।" চার্লির কথা শুনে কোনও উত্তর না দিয়ে সেনেট চলে গেল।

রাতে চার্লির হোটেলে এলো একজন অভিনেতা। চার্লি যখন তাঁর কাছে জানতে চাইল সত্যি সত্যিই সেনেট ওকে সরিয়ে দেবেন কিনা অভিনেতা বন্ধুটি জানাল ম্যাক সেনেটের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। সেনেট প্রচণ্ড খেপে গেছে। চার্লি মনে মনে হিসেব করল ব্যাঙ্ককে কত জমিয়েছে। পনেরশো ডলারেরর মত আছে। তেমন কিছু হলে সিধে টিকিট কাটবে ইংল্যাণ্ডের। কিন্তু সেনেট পাকাপোক্তভাবে না তাড়ানো পর্য্যন্ত চার্লি নড়ছে না। পরদিন যথারীতি চার্লি স্টুডিওতে গেল। সাজঘরে ঢুকল মেক আপ নিতে। আটটা থেকে শুটিং। আটটা বাজতে দশ মিনিট আগেই সেনেট চার্লির ঘরে ঢুকল।

মিষ্টিমধুর গলায় বলে উঠল, "দয়া করে আপনি একটু মিস্ মেবেলের ঘরে আসবেন ? ভীষণ জরুরী কথা আছে।"

চার্লি যখন মেবেলের ঘরে গেল তখন মেবেল ঘরে ছিল না। ছবির প্রোজেকশান দেখছিল। চার্লি এসেছে শুনে ছুটতে ছুটতে এলো। সেনেট অনুশোচনার গলায় জানালেন—"মিঃ চ্যাপলিন, কাল রাগের মাথায় কি বলে ফেলেছি, ওটা আপনি ভুলে যান।" মেবেল ও ওর অন্যায় আচরণের জন্য লজ্জিত। ওর হয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি, মেবেল—আমরা সবাই আপনার কাজের প্রশংসা করি। আমি তো আপনার অভিনয়ের অন্ধ ভক্ত।

চার্লির মনে তখন। একের পর এক বিস্ময়ের পালা চলছে। এত চমক এক সঙ্গে সইলে হয়। এখনকার মেবেল আর গতকালের মেবেলের সঙ্গে কত তফাত। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে না তো সে।

থতমত ভাবটা কাটিয়ে চার্লি বলল, "মিস্ মেবেলের কথা তিনি মেনে চলেন নি একথা ঠিক নয়। বরং বলা যায় মিস্ মেবেল যা করতে বলেছিলেন সে তার সঙ্গে আরও কয়েকটা নতুন কৌতুক নক্সা জুড়ে দিতে চেয়েছিল এই আর কি। কিন্তু মেবেল তা মানতে চাইছেন না। আর যোগ্যতার ব্যাপারে যা আমি বলেছি তা তো ঠিকই।"

সেনেট মোলায়েম সুরে বললেন—"যথার্থ বলেছেন। মেবেলের বয়স অল্প। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বাড়ে আর যোগ্যতারও প্রমাণ হয়। তাই তার কথা কিছু মনে করবেন না। বরং আমি চাই কাল থেকে আপনি আবার পুরো উদ্যমে শুটিং সুরু করুন। যেখানটা যে রকম করলে ভাল হবে তাইই করবেন। কারোর নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। ছবির স্বার্থেই আপনাকে একথা বলছি।" "গতকাল আমি যেরকমভাবে অভিনয় করব বলে স্থির করেছিলাম আপনার তাতে মত আছে তাই তো?"

"হ্যাঁ আমার আর কোনও দ্বিধা নেই। আপনার যেমন ইচ্ছে তেমন ভাবেই অভিনয় করুন। কোনও বাধা আসবে না।"

"আমি যদি নিজে থেকে কোনও ছবি পরিকল্পনার ভার নিই?" হঠাৎ-ই থেমে গেলেন সেনেট। তারপর একটু ভেবে বললেন "এত

বড় ঝুঁকি নেওয়াটা কি এখনই ঠিক হবে। অতগুলো টাকার দায়িত্ব! শেষ পর্য্যন্ত ছবি যদি মুক্তি না পায় তবে কি হবে বলুন তো?"

"আমার সঞ্চয় আছে দেড় হাজার ডলার। এটা আমি জামানত হিসাবে ছবি তোলার আগেই আপনার কাছে রাখব। ছবি মুক্তি না পেলে সব টাকা আপনার।"

"গল্পর কথাও তো ভাবতে হবে।"

"গল্পের আবার অভাব! আমার ভাঁড়ারে গল্পের অভাব নেই।"

ভাবলেন খানিকক্ষণ সেনেট। তারপর বললেন—"আচ্ছা পরে ভেবে দেখব, কি করা যায় ব্যাপারটা নিয়ে। আপাততঃ মেবেলের ছবিটাতো আগে শেষ হয়ে যাক।"

সেনেট চলে গেলেন। চার্লি মেবেলের কাছে নিজেই তার পূর্ব দিনের রূঢ় আচরণের জন্য মাপ চাইল। মেবেল নিজেও তার আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। শুটিং সেদিনও বন্ধ রইল। সেদিন রাতে সেনেট হোটেলে চার্লিকে নিয়ে গিয়ে জবরদস্ত খাওয়াল। এমনকি গাড়ী করে চার্লির হোটেলের দরজায় তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। পরদিন সুটিংএর সময় চার্লি যখন যেমনভাবে অভিনয় করতে চাইল তাই-ই করল। কেউ বাধা দিল না। এমন কি মেবেলও মাঝে মাঝে এসে কোথায় কি করতে হবে চার্লির কাছে পরামর্শ নিতে লাগল। সবাই তো অবাক। চার্লির নিজের তো বিস্ময়ের বুঝি আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটা হলো— যেদিন চার্লির সঙ্গে সেনেটের কথা কাটাকাটি হলো সেদিন একরকমই ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে তাকে তিনি তাড়াবেন। কিন্তু অফিসঘরে গিয়ে দেখেন নিউইয়র্ক থেকে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। তারা জানিয়েছে যে চার্লির ছবির কাটতি বাজারে খুব বেশী। কিস্টোন কম্প্যানির প্রতিটি ছবির নাকি কুড়িখানা করে প্রিণ্ট হয়। কোন কোনটার অবশ্য ত্রিশখানা ও হয়েছে। অথচ চার্লির এ পর্য্যন্ত যে চারটে ছবি বাজারে মুক্তি পেয়েছে তার

শেষটায় কাটাতি হয়েছে পঁয়তাল্লিশ। তবুও সব চাহিদা মেটেনি। আরও ছাপাতে হবে। সুতরাং চার্লির ছবি যেন বেশী বেশী করে তৈরী করা হয়। তাই তো সেনেটের যত্ন আত্তির ত্রুটি নেই।

চার্লি ততদিনে রপ্ত করে ফেলেছে ছবি তৈরীর মার প্যাঁচ। চার্লির কাছে তেমন কিছু জটিল মনে হয় নি। বরঞ্চ সোজাই লেগেছে। যেমন ঢোকবার আর বেরোবার রাস্তাটা ঠিক রাখতে হবে। কেউ যদি বাঁ দিক দিয়ে ঢোকে তবে তাকে বেরুতে হবে ডান দিক দিয়ে, পরে যখন আবার সে ঢুকবে তখন ঐ ডান দিক দিয়েই ঢুকবে। আবার ক্যামেরার মুখোমুখি তাকিয়ে কেউ যদি পেছিয়ে আসে। যখন সে ক্যামেরার দিকে পেছন করেই ঢুকবে। এছাড়া রয়েছে ক্যামেরা বসানোর ব্যাপারটা। ক্যামেরা বসানোর ব্যাপারটায় হলো সিনেমার নিজস্ব কায়দা।

চার্লি যখন প্রথম পাকাপোক্তভাবে নির্দেশনার কাজ শুরু করলো তখন কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু আতঙ্কই হলো ওর। ছবির শুরুতে কাজ দেখতে এলেন ম্যাক সেনেট। দেখে ভালই বললেন। শুনে স্বস্তি পেল চার্লি।

চার্লির প্রথম ছবি **"Caught in the Rain"** দুনিয়া কাঁপিয়ে না দিলেও আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছিল। ছবির যখন প্রোজেকশান দেখা চলছিল তখন তো উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় চার্লির স্নায়ু ছেঁড়ার জোগাড়। ঘরের সামনে সমানে পায়চারি করে চলেছিল সে। ম্যাক সেনেট ম্যাক্সেল ও অন্যান্যরা ছবি দেখে কি বলবে তাই ভেবেই চার্লি অস্থির। একটু পরেই ম্যাক সেনেট বেরিয়ে এলেন —"মিঃ চ্যাপলিন, খুব ভালো হয়েছে। পরের ছবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করে দিন।"

সেইদিন থেকে সমানে গল্প লেখা আর ছবি তোলার পালা শুরু হলো। সেনেট প্রতিটি ছবির জন্য চার্লিকে পঁচিশ ডলার বোনাস দিতেন আলাদা ভাবে।

কেন্দ্র করে মঞ্চে অভিনেতাদের মধ্যে বিশেষ একজন। তারপর একক অভিনয়। সম্পূর্ণ দায়িত্ব শীলতায় গঠিত চলচিত্র তৈরীর কাজ। মঞ্চ সব সময় অভিনেতাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়। কিন্তু বিশ্বজোরা প্রচারের জন্য চলচিত্রে, সেইকাজেই চার্লি চ্যাপলিন মেতে উঠলেন একের পর এক শিল্প সৃষ্টি চার্লিকে এনে দিল দুর্লভ সম্মান যা আজ অবধি কোন অভিনেতা পায়নি, তাই অভিনয় জগতে চার্লির যুগ কোন দিন হয়ত শেষ হবেনা।